মুক্তিযুদ্ধ
কেন
অনিবার্য ছিল
ডঃ কামাল হোসেন

আমাদের স্বাধীনতা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি ছিল ইতিহাসের এক অনিবার্যতা। পাকিস্তানি শাসক— সামরিক জান্তা ও রাজনীতিকদের ভূমিকা সেই পরিণতিকেই ত্বরান্বিত করেছে। *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল?* বইটিতে ড. কামাল হোসেন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই নিকট পরিপ্রেক্ষিতটিকেই প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে তুলে ধরেছেন।

রাজনীতিক পরিচয়ের বাইরেও ড. কামাল হোসেনের প্রতিষ্ঠা একজন শীর্ষস্থানীয় আইনবেত্তা ও সংবিধান-বিশেষজ্ঞ হিসেবে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। স্বাধীনতার পর তাঁরই নেতৃত্বে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। কিন্তু তাঁর আরেক বিশিষ্ট পরিচয়, ষাট দশক থেকে আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে এদেশবাসীর ওপর পরিচালিত দমন নীতির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকার কথা আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকেরই হয়ত অজানা। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় আসামি পক্ষের অন্যতম প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন তিনি। ১৯৬৯-এ লাহোরে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসেবে তিনি যোগ দেন। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বেও তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্যতম প্রধান সহযোগী, পরামর্শক। ১৯৭১এর মার্চে ইয়াহিয়া ও তার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনায়ও তিনি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ও সহযোগী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে অনেক নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। মোট কথা ওই কালপর্বের অনেক ঘটনারই তিনি একাধারে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী ও সক্রিয় অংশীদার। সেদিক থেকে ড. কামালের এই বইটির, বলাই বাহুল্য, একটি ঐতিহাসিক মূল্য বা তাৎপর্য রয়েছে।

ISBN 984 410 086 0

অগ্নিক্ষরা সে দিনগুলোর স্মৃতিচারণ এ যাবৎ অনেকেই করেছেন। তবে সে সবের অধিকাংশের সঙ্গে এ-বইটির তফাত হলো, এখানে লেখক ঘটনাপ্রবাহকে দেখেছেন ও বিচার করেছেন অনেকটা আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে। তারপরও যাকে বলে শুষ্ক পণ্ডিতি-আলোচনা এ বইটি মোটেও সে ধরনের নয়।

ঘটনার বিবরণ যা তৎকালে সংবাদপত্রে এসেছে এবং যা একান্তই ভেতরের ঘটনা—উভয়ই লেখক বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। অনেক ঘটনা বা তথ্য হয়ত এ-বইটি পড়েই আমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারি। দলীয় সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত এবং ঐতিহাসিকের দায়িত্ববোধ নিয়ে লেখা এ-বইটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চালচিত্র বুঝতে সহায়ক হবে। লেখাটি ইতিপূর্বে ভোরের কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্স বইটি প্রকাশ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন।

মতিউর রহমান
সম্পাদক, *ভোরের কাগজ*

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল

ড. কামাল হোসেন

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

সপ্তম মুদ্রণ
ডিসেম্বর ২০১৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 410 086 0

MUKTIJUDDHA KENO ANIBARYA CHILO by Dr. Kamal Hossein. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka One Hundred and Sixty only.

শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের
স্মৃতির প্রতি

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যে রাজনৈতিক–সাংবিধানিক আলোচনা শুরু হয়, তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই উত্তাল দিনগুলোতে আনুষ্ঠানিক আলোচনার বাইরে অনানুষ্ঠানিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা ও কার্যক্রমের সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তাদের সহচরদের বিভিন্ন চক্রান্ত ও ওয়াদা বরখেলাপের ঘটনাবলি খুব কাছে থেকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

তার আগেও সংবিধান বিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত একজন হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদসহ জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ছয়দফা আন্দোলন, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ও অপরাপর অনেক রাজনৈতিক ঘটনা ও সংগ্রামের গতিধারার সঙ্গে আমাকে বিশেষভাবে যুক্ত থাকতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব ও বাঙালির অধিকার আদায়ের বিশাল প্রেক্ষাপটে খুব কাছে থেকে দেখা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বস্তুনিষ্ঠভাবে আমি আমার *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল?* বইটিতে তুলে ধরেছি। লেখাটির মূল ইংরেজি ভাষ্য হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প' প্রণীত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র' পঞ্চদশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল? ইতিপূর্বে *ভোরের কাগজ* এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণটিও বেরিয়েছিল ভোরের কাগজ প্রকাশনী থেকে। পাঠক এ গ্রন্থ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা ও তার প্রেক্ষাপটের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনা জানতে পারবেন। আর এসব তথ্য ও ঘটনা যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে কিছুমাত্রও সহায়ক হয় তাহলে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করব।

মাওলা ব্রাদার্স বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ধন্যবাদ।

কামাল হোসেন

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে পাকিস্তান লোকবল ও ভূখণ্ড দুই–ই হারিয়েছিল। কিন্তু এর বিপরীতে দৃশ্যমান কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারেনি। ফলে পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীতে আইয়ুবের জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই নেমে গিয়েছিল, কারণ যে–জনপদ বেহাত ও সৈন্যহানি হয়েছিল তার বিপুল অংশই ছিল পাঞ্জাবি। তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে আইয়ুব পরিস্থিতি ও ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন বটে, তবে তা তাঁর নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর পরিবর্তে আরও ক্ষতিই করে বসল। কেননা, পাঞ্জাবিদের কাছে তাসখন্দ ঘোষণা ছিল 'সবকিছু বেচে দেওয়ার' শামিল, সোভিয়েত চাপের মুখে ভারতকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা। ভুট্টো, অনেকের এবং তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ীও, ছিলেন আইয়ুবকে ঐ দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী লোকদের অন্যতম। কিন্তু ঐরকম ভূমিকার জন্য জননিন্দার শিকার হওয়া থেকে ভুট্টো কেবল রেহাই লাভেই সক্ষম হলেন না, তিনি তাসখন্দ ঘোষণাবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে এবং ঐ ঘোষণার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অস্বীকার করতেও শুরু করলেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পর থেকে প্রায় অলসভাবেই বসে থাকা প্রবীণ পাঞ্জাবি রাজনীতিকরা এই অবস্থাকে একটি অসন্তুষ্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ স্থাপনের এবং সেই সঙ্গে আইয়ুবের পতন ঘটানোর সুযোগ হিসেবে দেখলেন।

পূর্বাঞ্চলে বাঙালিরা যুদ্ধের প্রতি পুরোপুরি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাল। তাদের মধ্যে এক সার্বিক নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি কাজ করছিল। তারা নিজেদেরকে অনাবৃত ও অরক্ষিত বোধ করল। বন্ধুভাবাপন্ন চীনাদের দেওয়া আশ্বাসের ওপরই পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—ভুট্টোর এরকম উক্তি বাঙালিদের সামান্যই সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল। কাজেই পূর্বাঞ্চলের সকল স্তরের মানুষের কাছে তাসখন্দ ঘোষণা ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হল।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবি নেতারা আইয়ুবের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ও একটি 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবিতে বিরোধী শক্তিগুলোকে একত্রিত করতে সক্রিয় হলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের দাবির সঙ্গে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করা গেলে আইয়ুবের ওপর চাপ সত্যিই কার্যকর হবে। শেখ মুজিবকে যুক্ত করার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের বিষয়টি সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ইত্তেফাকের প্রভাবশালী সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৬ সালের গোড়ায় লাহোরে বিরোধীদলীয় পাঞ্জাবি নেতাদের এক বৈঠকে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত পাঞ্জাবি নেতারা আইয়ুবের বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন বিরোধীদলীয় মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান এবং এই নিশ্চয়তা দেন যে, সেনাবাহিনী তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এ-ব্যাপারে তাঁরা 'পূর্ণ আস্থাবান'। তাঁরা এই ধারণা দেন যে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেই তাঁরা কথা বলছেন। তাঁরা চাইছিলেন যাতে ঐ মোর্চায় যোগ দিতে মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে রাজি করান।

কিন্তু মানিক মিয়া জানতেন, ঢাকায় তাঁর সামনে যে-প্রশ্নটি উত্থাপন করা হবে তা হল—আইয়ুবের কাছ থেকে আরেকদল পাঞ্জাবি নেতার কাছে যদি ক্ষমতার হাতবদল ঘটে তা হলে কি বাঙালিদের দুর্দশা, তাদের ওপর জমে থাকা অবিচারের প্রতিকার হবে? তাই তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, বৈঠকে উপস্থিত নেতারা রাজধানী কিংবা সশস্ত্রবাহিনীসমূহের যে-কোনো একটির সদর দপ্তর পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর অথবা দুই প্রদেশের সংখ্যাসাম্যভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বদলে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবে রাজি হবেন কি না। মানিক মিয়ার এ-প্রশ্নের জবাবে বলা হল—"আসুন, আগে তো আমরা আইয়ুবের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিই। তারপর দেখা যাবে আমরা কীভাবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করি।"

বাঙালিরা ভোলেনি যে, পাকিস্তানের প্রথম দশকে ঐসব রাজনীতিকরাই যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাঁরা কীরকম সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের বঞ্চিত করেছেন, বৈষম্যের শিকারে পরিণত করেছেন। 'এক ইউনিট' ও 'সংখ্যাসাম্য' তাঁদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। কাজেই ঐ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে একটি অভিন্ন জোট গঠন করলে তাতে পূর্ব বাঙলার কোনো লাভ হবে কি না সে-ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ ছিলই। এ-ধরনের জোটের প্রস্তাব বাঙালিদের মধ্যে কিছুটা আবেদন হয়তো জাগাতে পারত, যদি প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে বাঙালিদের কাছে আগেভাগেই সুনির্দিষ্ট ধরনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হত। অন্য কথায়, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে যদি আগাম অঙ্গীকার করা হত, যা ছিল বাঙালিদের দাবি।

মানিক মিয়া ফিরে আসার পরপরই জানুয়ারির শেষদিকে আইয়ুব খান ঢাকা এলেন। তিনি বিরোধীদলীয় বাঙালি নেতাদের তাঁর সঙ্গে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিব ছাড়া অন্য যাঁরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নূরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ বর্ষীয়ান নেতা। আইয়ুবের সঙ্গে বৈঠকের আগে শেখ মুজিব তাঁর কাছে পেশ করার জন্যে

একটি অভিন্ন দাবিনামার ব্যাপারে অন্যান্য বাঙালি নেতাকে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে অনানুষ্ঠানিক আলাপ–আলোচনা চালান। এসব আলোচনায় তিনি চাপ দেন যে, দাবিনামায় বাঙালির স্বার্থ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পরিসীমা ব্যাখ্যা করে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দফা থাকতে হবে। এ–সময়ই এ–সংক্রান্ত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দফা লিখিত আকারে তৈরি হয়। কাজটি করেন তাজউদ্দিন আহমদ, যিনি তখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শেখ মুজিব এসব দফার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য নূরুল আমিনকে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু নূরুল আমিনসহ অন্যান্য প্রবীণ নেতা এতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তাঁদের ধারণায় স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা হিসেবে ঐ দাবিগুলো ছিল বেশি রকমের বৈপ্লবিক, যা আইয়ুবকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। তাঁদের মতে, স্বায়ত্তশাসনের দাবি—সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং 'জাতীয় সরকারে' বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্তির মতো অপেক্ষাকৃত 'নরমপন্থি' দাবি–দাওয়াগুলো আইয়ুবের মেনে নেয়ার সুযোগ কমিয়ে দেবে। শেখ মুজিব তাঁর অবস্থানে অটল থাকেন। তিনি বলেন, অন্যান্য নেতারা যদি ঐসব দাবিদাওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নাও দেন, তা হলেও তিনি ঐ দাবিনামা—যা ছিল 'ছয়দফা'র পূর্বগামী—নিজেই পেশ করবেন। আইয়ুবের সঙ্গে বৈঠকটি ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ হল—কারণ, বৈঠকে বাঙালি নেতৃবৃন্দের মুখপাত্র হিসেবে নেতৃত্ব দেয়ার স্বঘোষিত দাবিদার হামিদুল হক চৌধুরীকে শেখ মুজিব প্রথমেই অস্বীকার করলেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাড়াই আইয়ুব খান বৈঠক ত্যাগ করলেন।

বিরোধীদলীয় পাঞ্জাবি নেতারা ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে বিরোধী নেতাদের এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। বাঙালি নেতাদের মধ্যে যাঁরা ঐ সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্যে আমন্ত্রিত হন শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে সম্মেলনে যোগ দেয়ার পরামর্শ দেন, কারণ সবদিক বিবেচনায় এটা বোঝা গিয়েছিল যে, সম্মেলনে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতির অর্থ দাঁড়াবে পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে সক্রিয় বিরোধী–শক্তির অনুপস্থিতি। মানিক মিয়া মধ্যপন্থার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে স্বায়ত্তশাসনসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দাবিনামার ব্যাপারে চাপ না দেয়ার জন্যে শেখ মুজিবকে রাজি করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঐ দাবিনামা উত্থাপনের ব্যাপারে নিজ দৃঢ় সংকল্পে অটল থাকেন।

লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিব যখন তাঁর 'ছয়দফা' উত্থাপনের চেষ্টা করেন তখন সম্মেলনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এমনকি সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে তা অন্তর্ভুক্ত করতেও অস্বীকৃতি জানান। সম্মেলনে জোরালো গুঞ্জন শুরু হয় যে, শেখ মুজিবের 'ছয়দফা কর্মসূচি' হল সেইরকম একটা–কিছু যা কিনা বিরোধী ঐক্য প্রতিহত করতে এবং বিরোধী নেতাদের মধ্যে বিভক্তিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের 'প্ররোচনায়' উত্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

সম্মেলনে নিজের প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগলাভে বঞ্চিত হয়ে শেখ মুজিব সম্মেলন ত্যাগ করেন এবং বিবৃতি আকারে সংবাদমাধ্যমে তা তুলে ধরেন। সমবেত বিরোধী

নেতৃবৃন্দ এতে প্রচণ্ডরকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেও এটা উপলব্ধি করেন যে, শেখ মুজিব যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই বাঙালিরা স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা সম্পর্কে আগাম প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের ঐক্যে যোগ দেবে না। কাজেই সুস্পষ্ট বিভক্তি নিয়ে লাহোর বৈঠক ভেঙে গেল। বিভক্তির একদিকে রইলেন পাঞ্জাবি নেতারা (প্রাচীনপন্থি বাঙালি নেতাদের দুর্বল সমর্থনসহ), আর অন্যদিকে উদীয়মান বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্বকারী শেখ মুজিব—যে-জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বাস্তব দাবির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশিত।

সরকার দ্রুতই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এ থেকে ফায়দা হাসিলে তৎপর হয়। শেখ মুজিব ও তাঁর 'ছয়দফা'র মাধ্যমে বাঙালিদের একটি জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ধারার প্রকাশ ঘটেছে একথা ফলাও করে প্রচার করে সরকার একঢিলে একাধিক পাখি শিকার করতে চাইছিল। এর দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম বিরোধীদলীয় ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যর্থতার জন্যে জনগণের চোখে বিরোধী পাঞ্জাবি নেতাদের কেবল হেয় করতেই চাওয়া হল না, শেখ মুজিবের সঙ্গে মিলে পাঞ্জাবি স্বার্থের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা'র কলঙ্কও তাদের ওপর আরোপ করা হল, যে-শেখ মুজিবের 'ছয়দফা' কিনা ঐ স্বার্থের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এই কৌশলে সরকার বিভক্ত-হয়ে-পড়া পশ্চিম পাকিস্তানি (পাঞ্জাবি) শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করল। ঐ শাসকগোষ্ঠীরই একটি অংশ তখন বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছিল।

সরকার যখন পরিস্থিতিকে এভাবে ব্যবহার করে, তখন জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং আইয়ুবের আইনমন্ত্রী এস এম জাফরের মতো ব্যক্তিরা ভিত্তিহীন কথাবার্তা ছড়াতে শুরু করেন যে বিরোধী ঐক্য নস্যাৎ করতে সরকারেরই ঘনিষ্ঠ লোকজনদের ইঙ্গিতে শেখ মুজিব ঐ কর্মসূচি দিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভিযোগটি স্পষ্টতঃই মিথ্যা, কারণ এর পরপরই ছয়দফা আন্দোলনের ওপর আইয়ুব সরকারের বর্বর নিপীড়ন নেমে আসে।

লাহোর সম্মেলনে পেশ করার উদ্দেশ্যে 'ছয়দফা কর্মসূচি' একটি লিখিত বিবৃতির আকারে তৈরি করা হয়েছিল। বিবৃতিটি ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ "শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচি—আমাদের বাঁচার দাবি" শিরোনামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে 'ছয়দফা' প্রসঙ্গে বলা হয় যে, এটি "দেশের দুই অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক সমাধানের মৌল নীতিমালা"। এতে জোর দিয়ে বলা হয়, এই দাবিসমূহ "আমার বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত নতুন কোনো দাবি নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব দাবি জনগণ সুদীর্ঘকাল ধরেই জানিয়ে আসছে এবং এসব দাবি পূরণে নেতাদের অঙ্গীকার দশকের পর দশক ধরে বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ঝুলছে।"

বিবৃতিতে **ছয়দফা**কে যেভাবে সূত্রবদ্ধ করা হয় তা নিম্নরূপ :

দফা ১ : সংবিধানে এমন বিধান থাকবে যাতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান একটি সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন) হিসেবে গঠিত হয় এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা গঠিত আইনসভার সার্বভৌমত্বসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা হয়।

দফা ২ : কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকার কেবল দুটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে—প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র। অন্যান্য সকল বিষয়ে ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলোর (স্টেটস) হাতে ন্যস্ত হবে।

দফা ৩ : মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ দুটি পদ্ধতির যে-কোনো একটি গ্রহণ করতে হবে : ক. দুই অঞ্চলের জন্যে দুটি পৃথক, কিন্তু অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে ; অথবা খ. সারাদেশের জন্যে একটি অভিন্ন মুদ্রা থাকবে, তবে পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধে কার্যকর সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ এবং পৃথক আর্থিক ও মুদ্রানীতি থাকতে হবে।

দফা ৪ : কর আরোপ এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ন্যস্ত হবে অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এ ধরনের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলোর রাজস্ব-আয়ের একটি হিস্যা পাবে এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর আয়ের ওপর সুনির্দিষ্ট হারে লেভি সংগ্রহের দ্বারা কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হবে।

দফা ৫ : ক. দেশের দুই অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দুটি পৃথক হিসাব থাকবে ; খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ; গ. কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গরাজ্যগুলো সমভাবে অথবা নির্ধারিত অনুপাতে মেটাবে ; ঘ. অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে দেশীয় পণ্য চলাচলের ওপর কর বা শুল্ক আরোপ করা হবে না ও ঙ. অঙ্গরাজ্যগুলোকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার, বিদেশে বাণিজ্য মিশন স্থাপনের এবং স্ব-স্বার্থে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

দফা ৬ : পূর্ব পাকিস্তানের একটি নিজস্ব আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পোষণ করার অধিকার থাকবে।

ছয়-দফার ১ম দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারের জন্যে সেই প্রাথমিক দাবির কথাই তুলে ধরা হয় যার প্রতি প্রায় সকলেই ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৬৬ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দাবি ছিল বিশেষ গুরুত্ববহ। আইয়ুব এমন এক সংবিধান চালু করে দেশ শাসন করেছিলেন, যা ছিল 'প্রেসিডেন্সিয়াল' পদ্ধতিতে এক সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের বিধানসম্বলিত। ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে' ফেডারেশন গঠনের দাবি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরে যে, ঐ প্রস্তাবে ব্রিটিশ-ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে 'সার্বভৌম, স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহে' পরিণত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছিল। অতএব, ব্রিটিশ-ভারতের যেসব প্রদেশ বা ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, সেগুলো 'সার্বভৌম' হবে—'লাহোর প্রস্তাব'-ই ঐ দাবির ভিত্তি যুগিয়ে গেছে। কাজেই তাদের মধ্যে যে-কোনো সম্মিলন হতে পারে কেবল স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে উপনীত পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে। যে-ফেডারেশন তারা গঠন করবে তা হতে হবে সেই চরিত্রের যা তারা সর্বসম্মতিক্রমে রূপ দিতে চায়। পূর্বকল্পিত কোনো আদল তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

যে-কেন্দ্রীয় সরকার তারা গঠন করবে তার কেবল সেইসব ক্ষমতাই থাকবে যা ঐ 'সার্বভৌম' ইউনিটগুলো 'অর্পণ' করবে। ঐ কেন্দ্রীয় সরকারকে কতটুকু ক্ষমতা দেয়া হবে কি হবে না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সার্বভৌম ইউনিটগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যে-ক্ষমতা তারা স্বেচ্ছায় অর্পণ করবে তার চেয়ে বেশি দেয়ার জন্যে ইউনিটগুলোকে বাধ্য করা যেতে পারে না। ফেডারেশন গঠন করতে গিয়ে আগেকার এককেন্দ্রিক পদ্ধতিকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) পদ্ধতিতে রূপান্তর করা চলবে না ; ব্রিটিশ-ভারতে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের আওতায় প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করে যেমনটা করা হয়েছিল। একটি 'খাঁটি ফেডারেশন'ই গঠন করতে হবে যেখানে অঙ্গীভূত ইউনিটগুলো তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কতিপয় ক্ষমতা অর্পণ করে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবে।

এই মৌলিক অবস্থানটিকে ১৯৪৭-এ ভারতবিভক্তির পর থেকে ২৪ বছর ধরেই সুপরিকল্পিতভাবে অন্ধকারে ঠেলে রাখা হয়। কিছু লোক পাকিস্তানের ওপর একটি সংবিধান চাপিয়ে দেয়, যে-সংবিধান সার্বভৌম ইউনিটসমূহ কর্তৃক ফেডারেল সরকারকে ক্ষমতা-অর্পণ নয় বরং এর বিপরীতে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা-মঞ্জুর করার ধারণা থেকে উৎসারিত। সন্দেহ নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভকারী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি নিজেদের স্বার্থেই ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের আওতায় বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণাকেই রক্ষা ও কার্যকর করে। এর পরও তাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস ছিল জাতীয় সংহতির নামে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী করা। বস্তুত 'ভারতের স্বাধীনতা আইনে' এই বিধান রাখা হয়েছিল যে, যতদিন পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক সভায় পাকিস্তানের (এবং ভারতের) সংবিধান প্রণীত হয়, ততদিন পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশসমূহ এবং কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র হয়ে 'অন্তর্বর্তী সংবিধান' হিসেবে কাজ করবে। সেখানে এই সত্যতা চাপা পড়ে যায় যে, অঙ্গীভূত ইউনিটগুলো নীতিগতভাবে 'সার্বভৌম' সর্বক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমতা ভোগকারী 'প্রদেশ' নয়, ১৯৪৭-এর আগে যা ছিল এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

২য় দফায় দুটি বিষয়ে (প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র) ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রের কথা বলা হয়, অবশ্য মুদ্রা তৃতীয় আরেকটি বিষয় হিসেবে যুক্ত হতেও পারে। এই দাবির অতীত পটভূমি ছিল। ১৯৪৬ সালের কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ এই তিনটি বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের গোড়ায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত সরকারবিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপগুলোর কনভেনশন এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের জাতীয় মহাসম্মেলনেও 'পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র' (ইউনাইটেড স্টেট্স অভ পাকিস্তান) নামে একটি ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়, যার কেন্দ্রের হাতে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ—এই তিনটি বিষয় থাকবে। ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত বিরোধীদলীয় যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ঘোষণাপত্রেও দাবি করা হয়েছিল যে, সংবিধানে এমন একটি ফেডারেশন গঠনের বিধান থাকতে হবে যার কেন্দ্রের হাতে

কেবল তিনটি বিষয়—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা থাকবে। সুতরাং ছয়দফা কর্মসূচির ২য় দফাটি ছিল সংবিধানের একটি মৌলনীতি হিসেবে পূর্বেই গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের আওতায় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনসংক্রান্ত একটি দাবির পুনরুক্তি।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দফাগুলো বাঙালিদের নিজস্ব সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতালাভের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রণীত। পাকিস্তানের গোড়ার দিকের দিনগুলো থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলার সঙ্গে 'ন্যায্য ব্যবহার' করা হচ্ছে না। প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় তহবিল, বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হওয়ার অনুভূতি ছিল। পরে এই বিশ্বাস প্রবল হয় যে, পূর্ব বাঙলা তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন লেখায় মূর্ত হয়ে ওঠা অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিসংখ্যান এই ধারণাকে আরও জোরালো করে তোলে। ঐসব লেখায় পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর বৈষম্যের পেছনে যে-বৈষম্যমূলক নীতিগুলো ছিল সেগুলো তুলে ধরা হয় এবং দেখানো হয় দেশের পশ্চিমাংশের অনুকূলে পূর্বাঞ্চলকে কীভাবে সুপরিকল্পিত ও উপর্যুপরি বঞ্চনার শিকারে পরিণত করা হচ্ছে।

এ-বিষয়টি পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করা হয় যে, প্রধানত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের কারণেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদের বিপুল পাচার ঘটছে। সে-কারণেই ছয়দফা কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আঞ্চলিকীকরণ।

ছয়দফার বীজ খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৬২ সালে ঢাকায় প্রকাশিত *বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই* শীর্ষক এক পুস্তিকায়। ঐ পুস্তিকায় বলা হয়, বৈষম্যরোধের একমাত্র কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ঐ পরিবর্তনের রূপরেখা হিসেবে প্রস্তাব করা হয় যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দিয়ে পরিবর্তে দুটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা গঠন করতে হবে এবং অর্থ ও অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলোকে (দেশের দুই অংশের জন্যে) দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে।

পুস্তিকায় এ-পরামর্শও দেয়া হয় যে, বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা দুই অঞ্চলের জন্যে পৃথকভাবে নির্ণয় করতে হবে এবং বৈদেশিক সাহায্যনীতি প্রণয়নে আঞ্চলিক সংস্থাগুলো সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। ঐ পুস্তিকায় উত্থাপিত এসব সুপারিশের মাঝে রোপিত ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিকীকরণের ধ্যান-ধারণার বীজ। যেমন—করারোপ, অর্থনৈতিক ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন, সম্পদ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদেশের (রিজিয়ন) কাছে হস্তান্তর।

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে দেখানো হয় যে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদ পাচারের মূলে রয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর

পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্যে অবাধে বরাদ্দ করা হচ্ছিল। বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছে পশ্চিমাঞ্চলের প্রকল্পগুলো যতটা সক্রিয় উৎসাহের সঙ্গে তুলে ধরা হত পূর্বাঞ্চলের বেলায় তা করা হত না। পশ্চিমাকালের সেচ, কৃষি ও শিল্পে বিপুল ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য ক্রমেই প্রসারিত করে চলছিল।

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ছয়দফা কর্মসূচি যখন চূড়ান্তভাবে প্রস্তাবিত হল তখন এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো বাধাটি আসে এর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যসংক্রান্ত দফাগুলোর ক্ষেত্রে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে-হাতিয়ারের জোরে দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম হচ্ছিল সে-হাতিয়ার তারা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না।

ফলে, ছয়দফা কর্মসূচির ব্যাপারে আইয়ুবের প্রতিক্রিয়া দাঁড়াল বলপ্রয়োগে এটি দমন করা। ছয়দফা দাবিকে আইয়ুব বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি বলে চিহ্নিত করে ঘোষণা করলেন, 'অস্ত্রের ভাষায়' তিনি এর জবাব দেবেন।

বাঙালির সমর্থনসূচক মনোভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করে শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচি জনগণের সামনে তুলে ধরলেন। আন্দোলন দ্রুতই দানা বাঁধতে শুরু করল। ফলে ১৯৬৬ সালের ১৮ এপ্রিল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হল এবং ৯ মে তাঁর বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনে (ডিফেন্স অভ পাকিস্তান রুলস, সংক্ষেপে ডিপিআর) আটকাদেশ জারি করা হল। ছয়দফার সমর্থনে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন বিক্ষোভ দিবসের ডাক দেয়া হল। বলপ্রয়োগে আন্দোলন দমন করতে তৎপর হল আইয়ুব সরকার। বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানো হল। নিহত হলেন বেশ কয়েকজন, বিপুলসংখ্যক মানুষকে গ্রেফতার করা হল। সে-সময় বাঙালির প্রধান মুখপত্র হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত সংবাদপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ করা হল ; এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)কে গ্রেফতার ও তাঁর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হল।

আন্দোলনের শুরুতেই এরকম দমন-পীড়নে আন্দোলন কিছুটা থমকে গেল। সরকারি দমননীতির প্রাথমিক জবাব হিসেবে হাইকোর্টে একাধিক রিট পিটিশন দায়ের করে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আদালতে তোলা হল।

পরিস্থিতি হঠাৎ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল '৬৭ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে। রাজনৈতিক মহল ও জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল নানা গুজব। আইয়ুব খান তখন পূর্ব পাকিস্তান সফর করছিলেন। সফরসূচিতে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনার দাউদ কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কথা ছিল। ঐ পরিদর্শন আকস্মিকভাবে বাতিল করা হল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, তাঁকে হত্যা বা অপহরণের চেষ্টা হতে পারে এমন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আইয়ুব তাঁর চট্টগ্রাম সফর বাতিল করেছেন। ওই সফর বাতিল যে শেষ মুহূর্তে করা হয় তা সুস্পষ্ট, কারণ প্রেসিডেন্টের সফর উপলক্ষে চট্টগ্রাম শহর এবং চন্দ্রঘোনা পর্যন্ত

সড়কপথ বিপুলভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো মটর শোভাযাত্রাই শেষ পর্যন্ত ঐ পথ অতিক্রম করেনি।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তায় আমার ব্যারিস্টার সহকর্মী আমীর-উল ইসলাম আমাকে জানালেন যে, তিনি কারাগারে তাঁর এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করেছেন যিনি গ্রেফতারের পর মারাত্মকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন এবং তাঁর শরীরে নির্যাতনের অনেক চিহ্নও রয়েছে। ওই বন্দি জানিয়েছেন যে, নির্যাতনকালে তাঁকে একটি 'ষড়যন্ত্র' মামলায় বেশকিছু লোককে জড়িয়ে জবানবন্দি দেয়ার জন্যে চাপ দেয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে আমীর-উল ইসলাম খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং কী করা উচিত সে-ব্যাপারে উপদেশ চাইলেন। তাঁকে পরামর্শ দেয়া হল বিষয়টি হাইকোর্টের গোচরীভূত করতে এবং ঐ বন্দির শরীর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের আরজি জানানোর জন্যে অতিদ্রুত পদক্ষেপ নিতে। সেদিনই সন্ধ্যায় নির্যাতনের অভিযোগ এবং ঐ বন্দিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হল। পিটিশনটি খুবই সাড়া জাগায় এবং মেডিক্যাল বোর্ড গঠনে আদালত সম্মত হয়। ঐ বন্দি ছিলেন কামালউদ্দিন আহমেদ, যিনি পরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১ নম্বর রাজসাক্ষী হন।

এর পরপরই পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার শুরু হয়। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের উর্ধ্বতন বাঙালি সদস্য আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস, খান শামসুর রহমান এবং সশস্ত্র বাহিনীর বেশ ক'জন বাঙালি সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অভিযুক্তদের মধ্যে আহমেদ ফজলুর রহমানই প্রথম, যিনি একজন আইনজীবীর সাক্ষাৎকার চান এবং তিনি আইনজীবী হিসেবে আমাকে মনোনীত করেন। '৬৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা ৬৮-র জানুয়ারির শুরুতে আমি কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি জানান যে, গ্রেফতারের অব্যবহিত পরে তাঁকে ঢাকার বনানীতে নতুন আবাসিক এলাকার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বেশ কয়েকদিন অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদকারীরা চাইছিল যাতে তিনি একটি 'ষড়যন্ত্র' মামলায় আরও লোকজনকে জড়িয়ে একটি বিবৃতি দেন। এসব গ্রেফতারের ঘটনার পাশাপাশি পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে উঠতে শুরু করে। এমনকি গ্রেফতারকৃতদের আইনজীবী হিসেবে যাঁরা কাজ করছিলেন, তাঁরাও গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। আহমেদ ফজলুর রহমানের পক্ষে একটি হেবিয়াস করপাস আবেদন পেশ করা হয়। সেদিনই ব্যারিস্টার কে জেড ইসলাম আমাকে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের পক্ষেও একটি আবেদন পেশ করতে বলেন। তাঁকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, প্রত্যেক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জন্যে পৃথক পৃথক আইনজীবীর কাজ করা উচিত, কারণ একটি অভিন্ন আইনগত মোর্চা অভিযুক্তদের মধ্যে 'যোগসূত্রের' লক্ষণ বলে মনে হতে পারে এবং কোনো 'ষড়যন্ত্র' মামলার ক্ষেত্রে সে-রকম ধারণার সৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত। পরে ইশতিয়াক আহমেদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের মামলা হাতে নেন। রুহুল কুদ্দুসের পক্ষে পিটিশন পেশ করেন রুহুল কুদ্দুসের আত্মীয়

কামালউদ্দিন হোসেন। হাইকোর্টে পিটিশনগুলো উত্থাপতি হলে সরকারি আইনজীবীরা আদালতে বলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু তদন্ত চলছে। জানুয়ারির গোড়ার দিকে সংবাদপত্রে দেয়া সরকারি তথ্যবিবরণীতে অভিযুক্তদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল না। জানুয়ারির ২০ তারিখে প্রচারিত সরকারি সংবাদভাষ্যেই প্রথমবারের মতো শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে।

এর পরের পাঁচমাস গোটা মামলাটি কঠোর গোপনীতায় ঢেকে রাখা হয়। এমনকি অভিযুক্তরা কোথায় আছেন সে-ব্যাপারেও কোনো তথ্য জানানো হয়নি। কারাগার থেকে সরিয়ে তাঁদের তখন সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল। বিচারকাজ একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের হাতে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এস এ রহমান এবং হাইকোর্টের দুজন বাঙালি বিচারক এম আর খান ও মাকসুমুল হাকিমের সমন্বয়ে ঐ বিশেষ ট্রাইব্যুনালটি গঠন করা হয়। গোড়া থেকেই অনুভূত হতে থাকে যে বিচারের প্রকৃতি হবে রাজনৈতিক। সরকারপক্ষের প্রধান তথ্য-প্রমাণাদি ছিল রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্য, আর আদালতে তাঁদের হাজির করার পর তারা নির্যাতনের অভিযোগ তুলে 'বৈরী' সাক্ষীতে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখান।

বিচার শুরু হওয়ার কিছুদিন পর লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ব্রিটিশ ব্যারিস্টার টমাস উইলিয়ামস কিউসি, এমপি (কুইনস কাউন্সেল, মেম্বার অভ পার্লামেন্ট) বিবাদীপক্ষের কৌসুলিদলে যোগ দিতে ঢাকায় এসে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি পুরো দল অভিযুক্তদের পক্ষে কাজ করছিল। ফলে এরকম ব্যবস্থা হল যে, দু'একদিন জেরা পরিচালনার পর টম উইলিয়ামস হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়েরের জন্যে কাজ করবেন। পিটিশনটি তৈরির ক্ষেত্রে আমি উইলিয়ামসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। খসড়াটি আমিই তৈরি করলাম। উইলিয়ামস রিট পিটিশনটি পেশ করার পর হাইকোর্ট একটি রুল জারি করল, তবে কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ দেয়া থেকে বিরত রইল। ইতিমধ্যে উইলিয়ামস অভিযোগ তুললেন যে, আইয়ুবের পুলিশ ও গোয়েন্দারা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। উইলিয়ামসের গাড়ি অনুসরণ করা হচ্ছিল, তবে খারাপ ব্যাপারটি ঘটল পরে, যখন উইলিয়ামসের কক্ষের তালা ভেঙে তাঁর জিনিসপত্র ও কাগজপত্র তছনছ করা হল। আয়কর পরিশোধের জন্যে তাঁর ওপর একটি নোটিশ জারি করা হল। ঢাকায় সপ্তাহকাল অবস্থানকালে তাঁর প্রচুর হয়রানি ভোগের পর স্থির হল যে, টম উইলিয়ামসের ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়াই ভালো। তাঁর সফর এবং মামলায় অংশগ্রহণ মামলাটির ওপর আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হয়। মামলাটির ওপর পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন পাঠিয়ে এবং বিশেষত টম উইলিয়ামসের হয়রানির বিষয়টি তুলে ধরে লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সে-সময়ের নবীন প্রতিবেদক পিটার হ্যাজেল হার্স্ট এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

মামলার অগ্রগতি এবং প্রতিদিনের কাজের আক্ষরিক বিবরণাদি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ায় মামলাটির ব্যাপারে জনমনে প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। আইয়ুব সরকার যদি ভেবে থেকে থাকে যে মামলাটি শেখ মুজিবকে জনগণের কাছে কলঙ্কিত করবে, তা হলে ঘটনাটি ঘটে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙালি জনগণের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্যাতিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি জনমনে প্রগাঢ় সহানভূতি অর্জন করে। বাঙালির দুঃখ-দুর্দশা এবং দাবিদাওয়াসমূহ এর ফলে ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে বাঙালির চেতনা প্রবলতর হয়।

১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে আইয়ুব খান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রশাসনের ওপর তার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যায়। ফলে একজন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ এবং ক্ষমতাকেন্দ্রের আশপাশে বিচরণকারী ভুট্টোর মতো উচ্চাভিলাষী লোকেরা আইয়ুবের দুর্বল হয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের সুযোগের সম্ভাবনা দেখতে পান।

বছরের শেষ নাগাদ দেশের উভয় অংশে দুঃখ-দুর্দশা পুঞ্জিভূত হয়ে ওঠায় আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের যথাযথ পরিবেশ তৈরি হয়। নভেম্বরে পেশোয়ারে ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযানের ফলে সৃষ্ট বিক্ষোভ দমনকালে পুলিশি হামলায় বেশকিছু ছাত্র আহত হয়। ভুট্টো, যিনি তখন রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করছিলেন, ঐ ঘটনাকে পুঁজি করে মাঠে নামেন। জনগণের মধ্যে উত্তেজনা দানা বাঁধতে শুরু করে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মওলানা ভাসানী এক জনসভা শেষে পরদিন ঢাকায় হরতাল ডাকলেন। হরতালটি ব্যাপকভাবে সফল হল এবং পূর্বাঞ্চলের জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে চাঙ্গা করতে জোরালো অবদান রাখল। পরবর্তী ধাপ নির্ধারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসলেন এবং ১৩ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করলেন। এর আগে, মওলানা ভাসানীর ৮ তারিখে হরতাল ডাকার চেষ্টা সফল হল না। দেশে তখন জরুরি অবস্থা জারি ছিল, আর হরতাল বানচাল করতে নিয়োজিত ছিল সর্বাত্মক সরকারি শক্তি। কিন্তু সরকারের সকল অপচেষ্টা নস্যাৎ করে ১৩ ডিসেম্বরের হরতাল পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করল। মূর্ত হয়ে উঠল জনগণের সরকারবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা। জনগণ আন্দোলনের জন্যে সুস্পষ্টভাবেই প্রস্তুত ছিল। এদেশের সকল আন্দোলনের সবচেয়ে জঙ্গি ও সক্রিয় শক্তি ছাত্রসমাজ এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিয়ে একটি গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগঠিত করল। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি)। এই পরিষদ গঠনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) তৎকালীন সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদকে ব্যাপক জনগণের সামনে তুলে ধরে। তোফায়েল ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগারো-দফা দাবিনামা প্রস্তুত করল। বস্তুত এগারো-দফা কর্মসূচিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—এর কেবল প্রথম দফাটিতেই শিক্ষাক্ষেত্রের

বিভিন্ন বিষয়ে ১৫টিরও বেশি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব দাবির মধ্যে ছিল 'শিক্ষা বেতন শতকরা ৫০ ভাগ কমাতে হবে,' 'পলিটেকনিক ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত কোর্সের সুবিধা দিতে হবে' থেকে শুরু করে এ-ধরনের সাধারণ দাবিদাওয়া—যেমন 'শিক্ষাক্ষেত্রের সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা' এবং 'অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে হবে'। এরপর আসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিশদ দাবিসমূহ। এগারো-দফায় আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচিকে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূত করা হয়, যদিও সূত্রবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ রদবদল করা হয়েছিল। এগারো-দফায় সাবেক প্রদেশগুলোকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার এবং পশ্চিমাঞ্চলে একটি সাব-ফেডারেশন গঠনের দাবি জানানো হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল পশ্চিমাঞ্চলে এক ইউনিট ভেঙে দেয়া। এগারো-দফা কর্মসূচিতে সকল দমনমূলক আইন বাতিল ও সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করা হয়, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারেরও দাবি তোলা হয়। পররাষ্ট্র বিষয়ে সিয়াটো ও সেন্টো (মার্কিন প্রভাবাধীন দুটি আন্তর্জাতিক জোট) ত্যাগ, পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং 'নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি' প্রণয়নের দাবি করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাংক, বীমা ও পাটসহ সকল প্রধান শিল্প জাতীয়করণের দাবি জানানো হয়। কৃষিখাতে খাজনা ও ভূমি রাজস্ব কমানো এবং কৃষকদের বকেয়া খাজনা ও কৃষিঋণ মওকুফের এবং পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪০ টাকা ধার্য করার দাবি করা হয়। শিল্প-শ্রমিকদের ন্যায্য বেতনসহ বিভিন্ন কল্যাণ-সুবিধা দেয়ার দাবি এবং 'শ্রমিকবিরোধী কালো আইন' বাতিলের দাবি জানানো হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবিও এগারো-দফায় ছিল। এভাবে ছাত্রদের এগারো-দফা এদেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্যে একটি বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচিতে পরিণত হয় এবং এই কর্মসূচি সামনে নিয়ে ছাত্রসমাজ আন্দোলনে নামে।

এ-ধরনের একটি বিস্তারিত দাবিনামা ছিল বহুদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এগারো-দফায় ছয়দফা কর্মসূচির মৌল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি এই তাৎপর্য বহন করে যে, ঐ কর্মসূচি কেবল একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলেরই দাবি রইল না বরং বহু রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্তি থেকে আসা সকল প্রধান ছাত্র সংগঠনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তা হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণের মৌলিক রাজনৈতিক দাবি।

এগারো-দফায় অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া তুলে ধরে ছাত্ররা এ-বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, কোনো সফল রাজনৈতিক সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক পন্থায় গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা অপরিহার্য। এগারো-দফায় পররাষ্ট্র নীতিবিষয়ক দাবি দেশের জন্যে একটি স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও পদক্ষেপ নির্ণয়ের জন্যে বৈঠক করতে থাকেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। শেখ মুজিব এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায় অপরাপর বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব বর্তায়

সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর। ৬ জানুয়ারি (১৯৬৯) এক সফল হরতালের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (রিকুইজিশনপন্থি), কেএসপি, আওয়ামী লীগ (পিডিএমপন্থি), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ১০ জানুয়ারি ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হলেন।

এ-সময় কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলের এক সভায় যোগদান শেষে আমি ঢাকায় ফিরে আসি এবং দেখতে পাই যে, নেতারা একটি অভিন্ন দাবিনামায় একমত হতে পারছেন না। এক্ষেত্রে প্রধান বাধাটি দাঁড়িয়েছে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ছয়দফা ফর্মুলা অনুমোদনে পাঞ্জাবি নেতাদের অনীহা। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতেও তাঁদের আপত্তি ছিল। আর আওয়ামী লীগ নেতারা চাপ দিচ্ছিলেন যে, একটি অভিন্ন দাবিনামায় ঐসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্তেই কেবল তাঁরা প্রস্তাবিত ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটিতে যোগ দিতে পারেন।

বিরোধী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই আলাপ-আলোচনায় দেশের দুই অংশের রাজনীতিকদের লক্ষ্যের বৈপরীত্যগুলো প্রতিফলিত হয়। এই বিভেদ এ পর্যায়ে চাপা দেয়া হয় কেন্দ্রে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (ফেডারেল পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্ট)-এর অভিন্ন দাবি সামনে এনে। তবে ছাত্ররা যে-এগারো-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে গণআন্দোলন শুরু করেছিল তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ছয়দফা কর্মসূচির মর্মবস্তু ইতিমধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল।

গণআন্দোলন জোরদার হতে লাগল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নবগঠিত ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) ১৭ জানুয়ারি 'জাতীয় বিক্ষোভ দিবস' আহ্বান করল। সিদ্ধান্ত হল, মিছিল নিষিদ্ধ করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় কোনো আদেশ জারি করা হলে তা অমান্য করা হবে। ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রতীক হিসেবে ডাক নেতৃবৃন্দ নগরীর কেন্দ্রস্থল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন। বিষয়টি এই অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক নেতারা এই প্রথমবারের মতো একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আইন ভাঙলেন। কিন্তু গণআন্দোলনের জঙ্গি অংশ ছাত্ররা এ-ধরনের প্রতীকী আইন ভাঙায় সন্তুষ্ট ছিল না। ২০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বিশাল ছাত্র-মিছিল বের হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ মিছিলটির ওপর গুলি ছোড়ে এবং এতে ছাত্রনেতা আসাদ নিহত হন। শহীদের রক্ত গণআন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা। আসাদ তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করার পর—ডাকের পরিবর্তে—আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যত চলে গেল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হাতে। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে উত্তেজনা প্রবলতর হয়ে উঠল। জরুরি অবস্থা জারি থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মিছিল দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পুলিশের গুলিতে আরও মানুষের প্রাণহানি ঘটল। বিক্ষোভ দমনে পুলিশকে সহায়তা করতে মোতায়েন করা হল সামরিক বাহিনী। বস্তুত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সকল নির্দেশই অমান্য করা হতে লাগল। নগরীতে বলবৎ কারফিউ প্রতি মুহূর্তে ভঙ্গ হতে লাগল এবং কোনো কোনো স্থানে সৈন্যদের

বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠল। আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ করার চেষ্টায় সৈন্যরা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করল। ফলে মিছিলে একজন স্কুলছাত্র, নিজ গৃহে একজন গৃহবধূ, মায়ের কোলে একটি শিশু এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একজন শিক্ষকসহ বহু মানুষ নিহত হলেন। প্রবল আন্দোলনের মুখে সরকার পুরোপুরি ধসে পড়ল। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সংগ্রাম কমিটিগুলো আইন-শৃঙ্খলা সংস্থাগুলোকে কার্যত প্রতিস্থাপিত করল। শহরাঞ্চলে বর্ধিত বেতন ও উন্নত কর্ম-পরিবেশের দাবিতে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের বিরোধ মেটাতে ছাত্রনেতাদের ডাকা হতে লাগল।

পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানেও গণআন্দোলন জোরদার হচ্ছিল। এটা সুস্পষ্ট হল যে, যে-আইয়ুব সরকার মাত্র ক'মাস আগেই সেনাশাসনের 'অগ্রগতির দশক পূর্তি' উদ্‌যাপন করেছে, সেই সরকার এখন জনগণের দাবি মেটাতে সকল মহল থেকেই প্রবল চাপের মুখে পড়েছে।

এ-সময় অন্য একটি মামলার প্রয়োজনে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি মঞ্জুর কাদেরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষুব্ধ বলে আমার মনে হল। এই সুযোগে আমি তাঁকে বললাম, জনগণের সামনে 'খুবই বিলম্বে, সামান্য কিছু' পেশ করার দায় এড়াতে আইয়ুব সরকারের উচিত দেয়ালের লিখন পড়া এবং সময় থাকতেই গণদাবির কাছে আত্মসমর্পণ করা। মঞ্জুর কাদের তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এভাবে যে, জনগণের দাবি মেনে নিতে তিনি আইয়ুব খানকে চাপ দেবেন। কিন্তু এরপর তিনি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন, যার স্থপতি ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি এরকমও দাবি করলেন যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রই সেই পরিবেশ এনে দিয়েছে যা চলতি আন্দোলন শুরুর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। মনে হল, তিনি গণজাগরণের জন্যে কৃতিত্ব দাবি করছেন।

এই পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান তাঁর 'মাস পয়লা' বেতার ভাষণে ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন, তিনি বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনায় আমন্ত্রণ জানাবেন। এই প্রস্তাবিত আলোচনাকে অচিরেই 'গোলটেবিল বৈঠক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হল। ডাক-এর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে সম্বোধন করে এক চিঠিতে আইয়ুব ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসতে বললেন।

এই পদক্ষেপ গণআন্দোলনের শক্তি ও আইয়ুবের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার পরিচায়ক হিসেবে গণ্য হল। আলোচনায় বসার পূর্বশর্ত হিসেবে ডাক সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করল। এ-পরিপ্রেক্ষিতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নটি বিশেষ জরুরি হয়ে দেখা দিল। পূর্ব পাকিস্তানে ডাক-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার আওয়ামী লীগ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল যে, আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম পূর্বশর্ত হচ্ছে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তি। ডাক-এর পাঞ্জাবি নেতারা এবং প্রাচীনপন্থি বাঙালি নেতাদের মধ্যে কেউ-কেউ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার ও

শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে চাপ দেয়ার প্রশ্নে দ্বৈত মনোভাব দেখাতে লাগলেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে কথাবার্তায় তারা এ-ব্যাপারে আইনগত অসুবিধার ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে, শেখ মুজিবের মুক্তি ও 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' তুলে নেয়ার বিষয়টি আলোচনার টেবিলে আদায় করে নেয়া যাবে। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, আওয়ামী লীগের পূর্বশর্তে ঐ নেতাদের বিরোধিতার কারণ ছিল তাদের এই আশঙ্কা যে, আলোচনায় শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের ফলে যে-কোনো রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্নেই 'ছয়দফা কর্মসূচি' কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠবে।

যাহোক, বিশেষ করে অন্য বাঙালি নেতারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন, শেখ মুজিবের ছয়দফাকে এড়িয়ে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের যে-কোনো প্রচেষ্টাই বাঙালি জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে এবং ঐ ধরনের চেষ্টা তাঁদেরকে সম্পূর্ণ আপোসের পথেও ঠেলে দেবে। 'গোলটেবিলে' অংশ নেয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ অটল রইল। এহেন চাপে পড়ে ডাক বিষয়টি আইয়ুবের কাছে উত্থাপন করল। আইয়ুব তা এড়িয়ে গেলেন এই বলে যে, শেখ মুজিব বিচারাধীন থাকায় এক্ষেত্রে কিছু 'আইনগত জটিলতা' রয়েছে।

বিরোধী নেতৃবর্গের, বিশেষত দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক মানিক মিয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৬ সালের জুনে যখন তাঁকে আটক করা হয় এবং ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়া হয়, তখন বিষয়টি হাইকোর্টে উত্থাপনের জন্যে আমাকেই নিয়োগ করা হয়েছিল।

মানিক মিয়ার সঙ্গে আমার নৈকট্য তখন থেকেই। মানিক মিয়ার বাড়ি ছিল বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে, রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের মিলনস্থল। শেখ মুজিবের মুক্তি এবং গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদানের প্রশ্নে মানিক মিয়া গুরুত্ব আরোপ করতেন। আলোচনাকালে আমি তাঁকে বললাম যে মামলার বিচারকাজের বিরুদ্ধে আইনগত আক্রমণ চালানোর কৌশল কাজে লাগিয়ে শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে আরও চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এসব যখন চলছিল, তখন শেখ মুজিব আদালতকক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে বার্তা পাঠালেন। আমি পরদিনই দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলাম। বিবাদি পক্ষের প্রধান কৌসুলি আবদুস সালাম খানের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে শেখ মুজিবকে উদ্বিগ্ন মনে হল। আবদুস সালাম খান ছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া পিডিএমপন্থি অংশের নেতা এবং তিনি শেখ মুজিবকে চাপ দিতে শুরু করেছিলেন যাতে শেখ মুজিব মামলা প্রত্যাহার কিংবা গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে নিজের মুক্তির প্রশ্নে পীড়াপীড়ি না করেন। তিনি এমনকি, এটা বোঝা গেল, এই প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিচ্ছিলেন যে, শেখ মুজিব যদি ঐ প্রশ্নে 'অনড় অবস্থান' বজায় রাখেন তা হলে তিনি অভিযুক্ত পক্ষের মামলা পরিচালনা করতে আর সক্ষম হবেন না। আবদুস সালাম খানের এরকম অবস্থান গ্রহণে শেখ মুজিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন বিবাদিপক্ষের কৌসুলি হিসেবে আমি যেন আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ নিই এবং মামলার বিচার প্রতিহত করার ব্যাপারেও আইনগত

পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এ–ব্যাপারে এ. কে. ব্রোহির সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার কথায় শেখ মুজিব একমত হলেন। এ. কে. ব্রোহি 'ইত্তেফাক'–সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করেছিলেন। আমি শেখ মুজিবের নির্দেশমতো কাজে নামলাম।

আন্দোলন যতই জোরালো এবং আরও জোরালো হয়ে উঠছিল, পুলিশ এবং গভর্নর মোনেম খান ও তাঁর প্রশাসন ততই পর্দান্তরালে পশ্চাদপসরণ করছিল। ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি মঞ্চে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিলেন, তিনি জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) জেনারেল মুজাফফরউদ্দিন। বোঝা যাচ্ছিল—সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন–চীফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর জিওসি–র মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির ব্যাপারে সরাসরি ধারণা পাওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন। এ–প্রসঙ্গে জানুয়ারিতে মানিক মিয়ার সঙ্গে মুজাফফরউদ্দিনের একটি বৈঠকের কথা আমার মনে পড়ছে। বৈঠকে মুজাফফরউদ্দিন মানিক মিয়াকে এরকম ধারণা দেন যে, ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতির ব্যাপারে মানিক মিয়ার মূল্যায়ন জানতে আগ্রহী এবং তিনি (ইয়াহিয়া) বিশ্বাসও করেন যে একটি রাজনৈতিক মীমাংসার উদ্যোগ নেয়া উচিত। ইয়াহিয়ার জন্য কোনো বক্তব্য থাকলে তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও তিনি (মুজাফফরউদ্দিন) নেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল যে, কমান্ডার–ইন–চীফ ইয়াহিয়া ইতিমধ্যেই এমনকিছু শুরু করেছেন যা তাঁর স্বাধীন ভূমিকার পরিচায়ক। যাহোক, বৈঠকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনারেল মুজাফফরকে পরিষ্কার ধারণা দিয়ে বোঝানো হয় যে, কেবল শেখ মুজিবের মুক্তির পরই একটি রাজনৈতিক মীমাংসার জন্যে আলাপ–আলোচনা শুরু হতে পারে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মুজাফফর জানালেন যে, তাঁকে যেসব বিষয়ে বলা হয়েছে তা তিনি ইয়াহিয়াকে জানিয়েছেন এবং ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে কোনো আইনগত উপায় খুঁজে পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করা হবে।

মানিক মিয়া আমাকে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া বন্ধের জন্যে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করলেন। এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ব্রোহির সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আমি করাচি গেলাম। ১৪ ফেব্রুয়ারি আমি করাচি পৌঁছলাম। সেদিন সারাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হচ্ছিল। আমি চমৎকৃত হলাম এটা দেখে যে, ঐদিন করাচির জনজীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। আমার হোটেল থেকে ব্রোহির বাসভবন পর্যন্ত আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচারপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আইনগত আক্রমণের যুক্তি রচনায় সহায়তা করতে ব্রোহি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন ; তবে বললেন যে তখন পর্যন্ত নথিভুক্ত তথ্য–প্রমাণাদিসহ মামলার যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখতে তাঁকে অবশ্যই ঢাকায় আসতে হবে। ঐদিনই সন্ধ্যায় আমি ঢাকা ফিরলাম। ব্রোহি এলেন পরদিন সকালে। সকল কাগজপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, বিচারের আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে এসেছিল যে, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হতে যাচ্ছে (১৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত থেকে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয়)। সেক্ষেত্রে, '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলো আবার কার্যকর হবে।

কাজেই, জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া মাত্র এই যুক্তি উত্থাপন করা যাবে যে, ঐ মামলার বিচার আর চলতে পারে না, কারণ বিশেষ বিধি-বিধান সম্বলিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সকল নাগরিকের জন্যে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারের নিশ্চয়তা দানকারী মৌলিক অধিকার লংঘন করে। কাজেই, মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্তদের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে সরকারের ওপর জারি করার জন্যে একটি 'ডিমান্ড অব জাস্টিস' নোটিশ প্রস্তুত করা হল। ব্রোহি ও আমি একযোগে মঞ্জুর কাদেরের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নোটিশটি হস্তান্তর করলাম। মঞ্জুর কাদের দেখলেন, যে-যুক্তি তোলা হয়েছে তাতে সারবত্তা রয়েছে ; তিনি অবিলম্বে এ-ব্যাপারে আইয়ুবের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন বলে জানালেন।

আমরা যখন মঞ্জুর কাদেরের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম তখন তিনি একটি টেলিফোন পেলেন এবং অপর প্রান্ত থেকে যে-খবর তাঁকে দেয়া হল তাতে তিনি স্পষ্টতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। মঞ্জুর কাদের আমাদের জানালেন যে, এইমাত্র তাঁকে বলা হল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেণ্ট জহুরুল হক একজন সামরিক রক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং আরও দুজন অভিযুক্ত আহত হয়েছেন। তাঁর উত্তেজনা থেকে এটা বোঝা গেল, গুরুতর অবস্থাটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। এটা স্পষ্ট ছিল যে, খবরটি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়বে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই মানসিক কষ্ট অনুভব করলাম, কারণ সার্জেণ্ট জহুরুল হক ছিলেন আমার বন্ধু ও সহকর্মী অ্যাডভোকেট আমিনুল হকের ভাই। মাত্র ক'দিন আগে আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, তাঁর ভাইয়ের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে আমি মামলায় অংশ নেব। মঞ্জুর কাদের উপলব্ধি করলেন, যে-নোটিশটি তাঁকে দেয়া হল সেটি মেনে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা কতটা জরুরি।

জহুরুল হকের দাফনের সময় নির্ধারিত হল ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে। পল্টন ময়দানে জানাজার পর কয়েকজন বন্ধুসহ আমি আজিমপুর গোরস্তানে গেলাম। নির্ধারিত সময়ের পর দুঘণ্টা পেরিয়ে গেল, কিন্তু লাশ এসে পৌঁছল না। এতে উপস্থিত সকলের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হল। পরে জানা গেল যে, লাশ নিয়ে আসার পথে মিছিলকারীরা এক মন্ত্রীর বাড়ি থেকে কিছু ফুল সংগ্রহের চেষ্টা করলে তাদের ওপর গুলি ছোড়া হয়। মিছিলকারীদের একাংশ এতে উত্তেজিত হয়ে ঐ বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর আরও বেশকটি সরকারি বাড়িতে হামলা চালানো এবং আগুন লাগানো হয়, যার একটিতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এস. এ. রহমান থাকতেন।

দাফনের পরপরই, ব্রোহি যে-হোটেলে অবস্থান করছিলেন সেখানে রওনা হলাম। পথে দেখতে পেলাম অনেক বাড়িঘর তখনও জ্বলছে। ব্রোহির সঙ্গে মঞ্জুর কাদেরকেও পেলাম। মঞ্জুর কাদের বললেন তিনি রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনো জবাব পাননি। মঞ্জুর কাদের জোর দিয়ে বললেন, জহুরুল হকের মৃত্যুতে জনগণের মধ্যে যে-আবেগ সৃষ্টি হয়েছে, যার পরিণতিতে ইতিমধ্যেই

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের বাসভবন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচার আর এগুতে পারে না। মঞ্জুর কাদের বললেন, এ-পরিস্থিতিতে বিচার চলতে পারে ভাবাটাই বাস্তবসম্মত নয়। তিনি এমনকি এরকম দার্শনিক যুক্তিও দাঁড় করালেন যে, বিচারের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করা যে অভিযুক্তরা দোষী এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাদের শাস্তি পাওয়া দরকার। কিন্তু যে-মামলার ক্ষেত্রে জনগণের আচরণ থেকে মনে হয় তারা ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছে যে, অভিযুক্তরা কেবল 'নির্দোষ'ই নয়, বরং 'বীর'—সে-মামলার বিচার চালিয়ে যাওয়ার আর তেমন কোনো যুক্তি থাকে না। স্থির হল যে, মঞ্জুর কাদের ও ব্রোহি দুজনই পরদিন সকালে রাওয়ালপিন্ডি রওনা হবেন এবং মামলার বিচার প্রত্যাহার ও সকল অভিযুক্তসহ শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে সরকারের ওপর জারি করা আইনগত নোটিশটির ব্যাপারে অভীষ্টলাভের চেষ্টা করবেন। দুদিন অতিক্রান্ত হল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ব্রোহি করাচি ফিরে টেলিফোনে আমাকে জানালেন যে, আইন মন্ত্রণালয় তখন পর্যন্ত নোটিশটি পরীক্ষা করে দেখছে।

অতএব, গোলটেবিল বৈঠক ১৭ ফেব্রুয়ারি বসতে পারল না। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে পিন্ডি গিয়ে শেখ মুজিবের মুক্তি আদায়ের জন্যে আরও চেষ্টা চালানোর অনুরোধ করা হল। সদ্যকারামুক্ত তাজউদ্দিন আহমদ, আমীর-উল-ইসলাম এবং আমি ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি পৌছলাম। শেখ মুজিব মুক্তি না পাওয়ার কারণে আইয়ুবের সঙ্গে ডাক-এর বৈঠক বসতে না পারায় সেখানে এক সংকটের হাওয়া বইছিল। বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত একজন আইনজীবী মানজার বশির স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্যে রাতেই আইনমন্ত্রী জাফরের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রায় মাঝরাতে আমাকে জানানো হল যে, সকালে জাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে। 'আইনগত সমস্যা' নিয়ে জাফর কিছু বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা বললেন, কিন্তু যখন তাঁকে আইনগত নোটিশটির জবাব দেয়ার জন্যে চাপ দেয়া হল তখন তিনি জানালেন, কেবল আইনগত বিষয় নয়—এর সঙ্গে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রশ্নও জড়িত।

জাফরকে উপলব্ধি করানো হল যে, নোটিশটি একটি সুস্পষ্ট জবাব পাওয়ার যোগ্য এবং আর সময় নষ্ট না করেই তা দেয়া উচিত। তিনি বললেন, ঐদিন সকালেই বিষয়টি মন্ত্রিসভায় বিবেচনা করা হবে এবং তিনি দুপুরের মধ্যেই একটি জবাব দেবেন। তিনি নোটিশটির একটি অনুলিপি অথবা সংক্ষিপ্তসার তাঁকে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই একটি নতুন নোটিশ তাঁকে পাঠানো হল। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ জাফর টেলিফোনে আমাকে জানালেন যে, তিনি আমার সঙ্গে মঞ্জুর কাদেরের হোটেল কক্ষে দেখা করবেন। জাফর এলেন এবং জানালেন যে, দীর্ঘ আলোচনার পর মন্ত্রিসভা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্তটি হল, নোটিশে উত্থাপিত দাবি মন্ত্রিসভা মেনে নিতে পারে না। ঘৃণা ও ক্রোধের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল আমার। একই প্রতিক্রিয়া হল মঞ্জুর কাদেরের, যিনি কিছুক্ষণ পরেই সেখানে উপস্থিত হলেন। সরকারের নেতিবাচক মনোভাবে মঞ্জুর কাদের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন, বিকেলে তিনি এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। এরপর তিনি জাফরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

বিকেলে মঞ্জুর কাদের টেলিফোন করে একই হোটেলে অবস্থিত তাঁর কক্ষে দেখা করতে বললেন। কক্ষে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাফরও সেখানে উপস্থিত হলেন। মঞ্জুর কাদের ও জাফর প্রস্তাব করলেন, সরকার এরকম একটি ঘোষণা দিতে প্রস্তুত যে, শেখ মুজিব 'একজন মুক্ত মানুষ' হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন। এর আইনগত দিকটি ব্যাখ্যা করতে বলায় জাফর বেশি কথা না বলে জানালেন, এটাই একমাত্র ফর্মুলা যা মেনে নেয়ার জন্যে সরকারকে তিনি রাজি করাতে পারেন। তাঁরা দুজনই অনুরোধ করলেন যেন আমি শেখ মুজিবকে একথা জানাই।

তাজউদ্দিন আহমদ, আমীর-উল-ইসলাম ও আমি লাহোর-করাচি হয়ে ঢাকার পথে রওনা হলাম। পরদিন সকালে ঢাকা পৌঁছার এটাই ছিল একমাত্র পথ। লাহোর বিমানবন্দরে আসগর খান এবং করাচি বিমানবন্দরে ব্রোহি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগের আগে মঞ্জুর কাদের আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, নোটিশে উথাপিত দাবি মেনে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করতে তিনি সন্ধ্যার দিকে আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন।

এটা ছিল ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্তী রাত। করাচি বিমাবন্দর থেকে টেলিফোনে মঞ্জুর কাদেরকে ধরা হল। মঞ্জুর কাদের বর্ণনা করলেন যে, তিনি আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় সারা সন্ধ্যা বসে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছে যে, আইয়ুব একটি জরুরি বৈঠকে ব্যস্ত আছেন। মঞ্জুর কাদের বিস্ময়ের সুরে আরও জানালেন যে, যদিও মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে কিন্তু আইয়ুব তখন পর্যন্ত বৈঠকেই রয়েছেন। তিনি বললেন, সম্ভবত সেটিই একমাত্র ঘটনা যে, তিনি আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন। মঞ্জুর কাদের বললেন, অবস্থাদৃষ্টে তাঁর মনে হচ্ছে খুবই বিশেষ ধরনের কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পরে জানা গিয়েছিল, সেটি ছিল আইয়ুবের ভবিতব্য-নির্ধারক সেই বৈঠক যাতে তিনি তাঁর তিন বাহিনী প্রধানকে ডেকেছিলেন। গণআন্দোলন দমনের জন্যে আইয়ুব সামরিক আইন জারি ও সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করতে বাহিনীপ্রধানদের সমর্থন চাইলেন। কিন্তু তাঁরা সামনে এগুতে অস্বীকৃতি জানালেন। বস্তুত আইয়ুব তাঁদের কাছে এক রাজনৈতিক বোঝায় পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলি তা-ই প্রমাণ করেছে। ইয়াহিয়ার নিজেরই উচ্চাভিলাষ ছিল। জনগণকে দমন করতে যদি সেনাবাহিনীকে ব্যবহৃত হতেই হয়, তা হলে তা হওয়া উচিত ইয়াহিয়া ও তাঁর আশেপাশে জুটে-যাওয়া চক্রের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। আইয়ুব ও তাঁর ধসে-পড়া সরকারের জন্যে আর কেন তারা ব্যবহৃত হতে যাবে?

১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব ও সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠক সম্পর্কে ইয়াহিয়ার এক উপদেষ্টা পরে যে প্রামাণ্য বর্ণনা দেন তা ছিল এরকম :

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়ার পর তাঁর কাছ থেকেই আমি জানতে পারি যে, ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব ও শীর্ষ সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে একগুচ্ছ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল আকবরসহ প্রেসিডেন্টের হাউস স্টাফের আরও ক'জন সদস্যও একথা বলেছেন এবং 'ভেতরের কথা' তাঁরা আরও ভালো বলতে পারবেন। আইয়ুবের সঙ্গে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান এবং তাঁদের সহায়তাকারীদের যৌথ ও পৃথক উভয় ধরনেরই বৈঠক হয়। সবচেয়ে জটিল বৈঠকটি হয় মধ্য–ফেব্রুয়ারিতে, যখন তিন বাহিনীপ্রধান (জেনারেল ইয়াহিয়া, এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খান ও ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান) বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনে সামরিক বাহিনীর ওপর আস্থা না রেখে আইয়ুবকে 'একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তের' পথ বের করার পরামর্শ দেন। বৈঠকের সবচেয়ে দুরূহ বিষয়টি ছিল : প্রভুর কাছে অপ্রিয় সত্য কথাটি কে পাড়বে? দ্বিধা, ইতস্তত মনোভাব ও নীরবতা ঘুরেফিরেই আসছিল। নৌবাহিনী–প্রধান আহসান উদ্যোগ নিচ্ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁর নিরপেক্ষতার ভাবভঙ্গি বজায় রাখতে চান ; ইয়াহিয়ার জন্যে সময়টা সংবেদনশীল, কারণ বেশ ক'জন সিনিয়র জেনারেলকে ডিঙিয়ে আইয়ুব তাঁকে প্রধান সেনাপতি (কমান্ডার–ইন–চীফ) বানিয়েছেন। কাজেই, শেষ পর্যন্ত বিমানবাহিনী প্রধান, স্পষ্টভাষী নূর খানের ওপর দায়িত্ব বর্তাল বিষয়টি তুলে ধরার। সশস্ত্রবাহিনীর তিন প্রধান কেবল প্রশাসনকে সচল রাখতে এবং কোনো বিদেশি রাষ্ট্র, যেমন ভারত, কর্তৃক পরিস্থিতির সুযোগ নেয়া ঠেকাতে সামরিক বাহিনীকে যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে ব্যবহার করতে সম্মত হলেন।

আইয়ুবকে দেয়া রাজনৈতিক সমাধানের পরামর্শ যে তাঁর কাছে এক প্রচণ্ড ধাক্কার মতো ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আঠারো বছর ধরে (১৯৫০–৬৮) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি তাঁদের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হলেন। সফররত এক বিদেশি অতিথিকে নাকি আইয়ুব বলেছিলেন, "সম্ভবত আমার মুখদর্শনেও ওরা এখন ক্লান্তি বোধ করে।"

আইয়ুব ও তাঁর বাহিনীপ্রধানদের মধ্যে যখন এই ব্যর্থ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন রাওয়ালপিন্ডিতে কী ঘটেছে সে–সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবহিত করতে আমার সহকর্মীরা এবং আমি ঢাকার পথে উড়ে চলেছি।

ঢাকা বিমানবন্দরে মানিক মিয়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে আমরা সরাসরি ক্যান্টনমেন্টে গেলাম। মুজিবকে জাফরের প্রস্তাবটি জানানো হল যে, তিনি একজন 'মুক্ত মানুষ'—সরকারের এই ঘোষণার ভিত্তিতে তিনি রাওয়ালপিন্ডি যেতে পারেন। শেখ মুজিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। শেখ মুজিব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠলেন, "এভাবে যাওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব? আমি কি পালিয়ে যাব বৈঠক করতে? আর এ–অবস্থায় বাইরে গেলে ওরা আমাকেও গুলি করে মেরে ফেলার সুযোগ নেবে—যেভাবে ওরা মেরেছে জহুরুল হককে।" তিনি বললেন, বিচার বন্ধের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই যে আইনগত নোটিশ দেয়া হয়েছে, ওদের (সরকারের) কাজ হল তা মেনে নেয়া। তা

ছাড়া অন্যান্য অভিযুক্তদের বন্দি অবস্থায় রেখে তিনি বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করতেও রাজি নন।

জেনারেল মুজাফফরউদ্দিনকে যখন একথা জানালাম তিনি বললেন, জাফরের সঙ্গে এ-ব্যাপারে টেলিফোনে আলোচনা করবেন। অতঃপর জাফরকে জানানো হল যে তাঁর প্রস্তাবিত ফর্মুলা শেখ মুজিবের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁকে আরও বলা হল যে, আইনগত নোটিশটি তিনি মেনে নিলে ভালো, অন্যথায় বিষয়টি হাইকোর্টে যাবে, আর হাইকোর্ট তখন মুক্তির আদেশ দিতে পারে। জাফর বললেন, কিছুক্ষণ পরে তিনি টেলিফোন করবেন। পরে টেলিফোন করে জাফর বললেন, হাইকোর্ট-প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, তার চেয়ে বরং ট্রাইব্যুনালকে বসতে এবং শেখ মুজিবকে মুক্তির অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে বলা যেতে পারে, যার ধরন হবে জামিনে মুক্তি।

শেখ মুজিবকে এই পরিস্থিতি জানানো হল। তিনি বললেন, জামিনের জন্যে তাঁর আবেদন জানানোর প্রশ্নই আসে না। ইতিমধ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের দুজন বাঙালি বিচারককে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সরকারপক্ষের একজন আইনজীবীকেও, যিনি প্রস্তাব করলেন যে শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। আমার সহকর্মী আমীর-উল-ইসলাম যখন শেখ মুজিবকে পরিস্থিতি জানাতে গেলেন, শেখ মুজিব তাঁর জামিনে মুক্তির প্রস্তাবটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমীর-উল-ইসলাম যখন শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন রেডিওতে প্রচার করা হচ্ছিল যে শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। এতে শেখ মুজিব ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

শেখ মুজিবকে সন্ধ্যায় মুক্তি দেয়া হচ্ছে, এ-খবর শুনে হাজার হাজার মানুষ এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকেও রওনা হয়। শেখ মুজিব জামিনে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় লাউডস্পিকার-সজ্জিত সেনাবাহিনীর গাড়ি থেকে জনসাধারণকে জানানো হতে থাকে যে, ঐদিন সন্ধ্যায় কোনো মুক্তির ঘটনা ঘটছে না। ইতিমধ্যে আইয়ুবের দুই মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও অ্যাডমিরাল এ আর খান ঢাকা পৌঁছলেন। আমি যখন শেখ মুজিবকে একথা জানিয়ে ফিরে আসছিলাম যে তাঁর সিদ্ধান্ত ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করা হয়েছে তখন অ্যাডমিরাল এ আর খান ও খাজা শাহবুদ্দিন শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রবেশ করলেন।

এটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, আইয়ুব সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। পেছনের খবরটিও স্পষ্ট ছিল যে সমস্ত বাহিনীপ্রধানরা তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারের সুযোগ তাঁর জন্যে আর খোলা নেই। অতএব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো ছাড়া আইয়ুবের উপায় ছিল না, আর সেই সুযোগ তিনি কেবল পেতে পারতেন শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে। কারণ, শেখ মুজিব ছাড়া আলাপ-আলোচনা দেশের পূর্বাঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে খুব সামান্যই প্রাসঙ্গিক হত।

পরদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা (আইয়ুব ও তাঁর সরকার) সেই ফর্মুলাতেই ফিরে গেলেন,

এর আগে আইনগত নোটিশে যে পরামর্শ তাঁদের দেয়া হয়েছিল যে, ঐ বিচার ছিল শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে অসিদ্ধ এবং সে–কারণে গোটা বিচারপ্রক্রিয়াই তুলে নিতে হবে।

শেখ মুজিব এ–জাতির মহানায়ক এবং পূর্ব বাঙলার গণমানুষের আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ঢাকায় একটি জনসভায় জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে জনগণের রায় গ্রহণের পরই কেবল তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার কথা বিবেচনা করবেন। দশ লাখেরও বেশি মানুষের এক বিশাল সমাবেশ শেখ মুজিবের ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের অঙ্গীকার করে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করল।

জনসভায় শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার জন্যে জনগণের অনুমোদন (ম্যান্ডেট) গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বাঙালি জনগণের দাবিদাওয়া তুলে ধরবেন। তিনি ওয়াদা করলেন, ঐসব দাবি যদি মেনে নেয়া না হয় তা হলে তিনি ফিরে এসে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন—কিছুতেই আপোস করবেন না।

দলের অন্যান্য নেতাকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাওয়ালপিন্ডি রওনা হলেন। আমাকে সঙ্গে যেতে বলা হল। কাকতালীয়ভাবে ভুট্টো ও শেখ মুজিব একই বিমানে লাহোরে পৌঁছলেন। ভুট্টো ও তাঁর সহকর্মীরা ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী ছিলেন, আর শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন ইকোনমি ক্লাসে।

শেখ মুজিব এটা দেখানোর সুযোগ পেলেন যে, আওয়ামী লীগ সত্যিকার অর্থেই সাধারণ মানুষের দল আর ভুট্টোর পিপলস পার্টি 'বড়োলোকদের দল'। ভুট্টো ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভুট্টো অনুমান করেছিলেন যে বৈঠক ব্যর্থ হবে। উল্লেখ করা দরকার, মওলানা ভাসানীও একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ফেব্রুয়ারিতে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে একটি বৈঠকের কথা আমার মনে পড়ে। বৈঠকে মওলানা বলেছিলেন যে, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না, তবে তিনি এর সাফল্য কামনা করেন এবং বলেন যে, বৈঠক থেকে যদি ভালো কিছু বেরিয়ে আসে তা হলে তিনি তাঁর অংশীদার হবেন। এসব বলার পর তিনি হাত তুলে গোলটেবিল বৈঠকের সফলতার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন।

লাহোর বিমানবন্দরে পৃথক পৃথক অভ্যর্থনাকারী দল ভুট্টো ও শেখ মুজিবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। অন্যান্যের মধ্যে এয়ার মার্শাল আসগর খান ও জেনারেল আজম খান শেখ মুজিবকে স্বাগত জানালেন। ভুট্টো পরামর্শ দিলেন যে, শেখ মুজিবের উচিত তাঁর (ভুট্টোর) সঙ্গে একযোগে বিমান থেকে অবতরণ করা। কিন্তু শেখ মুজিবকে যাঁরা নিতে এসেছিলেন তাঁরা এতে আপত্তি করলেন। অগত্যা ভুট্টো বিমান থেকে নেমে একটি ট্রাকে চড়ে তাঁর যথেষ্টসংখ্যক সমর্থকদের নিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করলেন। এরপর সঙ্গীদের নিয়ে শেখ মুজিব বিমান থেকে অবতরণ করলেন এবং বিপুল জনতার একটি

পৃথক মিছিলে শহরের দিকে রওনা হলেন। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতির আয়োজন করা হয়েছিল।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমরা রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছলাম। ডাক-এর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু সময়ের অভাবে পর্যাপ্ত আলোচনা সম্ভব হল না। পরদিন সকালের গোলটেবিল বৈঠক আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। তবে ঈদ-উল-আজহা নিকটবর্তী হওয়ায় এবং বৈঠকে যোগদানকারীদের মধ্যে পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন থাকায় ঐকমত্য হল যে, বৈঠক ১০ দিন স্থগিত থাকবে এবং ১০ মার্চ আবার বসবে। সিদ্ধান্ত হল যে, গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় বসার আগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও একটি অভিন্ন অবস্থান গড়ে তোলার জন্যে লাহোরে ডাক-এর বৈঠক কয়েকদিন ধরে চলবে।

ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব আমাকে 'বিশেষজ্ঞ'দের একটি দলের (প্রধানত অর্থনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক) সঙ্গে বসে ছয়দফা কর্মসূচিকে কার্যকর করার উপযোগী সাংবিধানিক প্রস্তাবমালা তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। ছয়দফা কর্মসূচি কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয় এবং ছয়দফার ভিত্তিতে টিকে থাকার উপযোগী কোনো কেন্দ্রীয় কাঠামো গঠনও সম্ভব নয়—এরকম সমালোচনার মোকাবেলায় এর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। বিশেষজ্ঞদলটি বেশকটি বৈঠকে বসে সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক প্রস্তাবমালা এবং বাদানুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিকল্প অবস্থানগুলো সূত্রবদ্ধ করল। যেসব আপত্তি উঠতে পারে সেগুলো খণ্ডন করার এবং উপযুক্ত জবাব তৈরিরও চেষ্টা করা হল।

১৯৬৯ সালের ৬ মার্চ শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীরা লাহোর গেলেন। আমাকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লাহোরে মিলিত হতে এবং একজন উপদেষ্টা হিসেবে রাওয়ালপিন্ডি যেতে বলা হল। ড. সরওয়ার মুরশিদ ও ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকেও প্রতিনিধি-দলে অংশ নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। লাহোর পৌঁছার প এটা বোঝা গেল যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের চিন্তাভাবনায় মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয়ায় একটি অভিন্ন দাবিনামার (চার্টার অভ ডিমান্ড) ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছা দুরূহ হয়ে উঠছে।

অসুস্থতার অজুহাতে শেখ মুজিব হোটেলকক্ষেই অবস্থান করলেন এবং ডাক-এর বৈঠকে যোগদান এড়িয়ে গেলেন। আসলে তিনি আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে থাকলেন। কারণ পাঞ্জাবি নেতারা অভিন্ন দাবিনামায় ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করার প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকায় ডাক-এর বৈঠক অচলাবস্থার দিকেই যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ যুক্তি দেখাল যে, ডাক একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় সরকারের' জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় জোটের আট দফা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিমাঞ্চলে এক ইউনিট বিলোপের দুটি বিষয়ই আবৃত করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও আওয়ামী লীগের এই যুক্তি সমর্থন করে। সরকারের 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' (ফেডারেল) ধরনটির বিশদ ব্যাখ্যা চাওয়া হল এবং বলা হল যে, সে-কারণে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের প্রশ্নে ডাক-কে একটি অবস্থান নিতে হবে। ধুরন্ধর পাঞ্জাবি নেতা, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ

আলি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের প্রশ্নে ডাক–এর অভিন্ন অবস্থান গ্রহণের প্রশ্নে তীব্র বিরোধিতা করে আসছিলেন। যখন তাঁকে বলা হল যে, 'ফেডারেল' বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করাটা জরুরি, তখন তিনি পালটা জবাব দিলেন এভাবে যে—সবাই জানে 'ফেডারেল' শব্দের অর্থ কী এবং প্রয়োজন হলে যে–কেউ অক্সফোর্ড ডিকশনারি খুলে তা দেখে নিতে পারেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থনসহ) গোলটেবিল বৈঠকে তাদের যোগদানের শর্ত হিসেবে ডাক–এর অভিন্ন দাবিনামায় ছয়দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে অটল রইল। তাঁরা উল্লেখ করলেন যে, গণআন্দোলনের চাপেই গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। গণআন্দোলনই তার সাংবিধানিক দাবিগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা এগারো–দফা কর্মসূচিতে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাতে (এগারো–দফায়) ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের দাবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ডাক–এর অভ্যন্তরে এহেন মেরুকরণের ফলে অতি দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান ডাক–এর (ইস্ট পাকিস্তান রিজিওনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি) এক বৈঠক আহ্বান করা হল। সকল বাঙালি প্রতিনিধির মধ্যে এই বোধের সঞ্চার করা হল যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান জনমত এবং এগারো–দফা আন্দোলনের উত্তাল অবস্থায় অন্তত বাঙালি নেতাদের উচিত বাঙালি জনগণের দাবিদাওয়া, বিশেষত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করা। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ডাক–এ পেশ করার জন্যে সর্বসম্মতভাবে একটি পাঁচ–দফা সুপারিশমালা গৃহীত হল। ঐ পাঁচ–দফায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় ডাক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে, সম্ভব হলে একটি অভিন্ন অবস্থান তৈরি করে নেয়ার উদ্দেশ্যে, একটি বিশেষ কমিটি গঠন করল। তবে পাঞ্জাবি নেতারা ছয়দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে বিরোধিতায় অটল থাকায় ঐ কমিটি অবচলাবস্থায় পড়ে রইল। তাঁরা তাদের কূটতর্ক ও আইনগত যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, ডাক কিংবা আইয়ুবের পার্লামেন্ট কোনোটিই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিবেচনা করার মতো 'গণরায়' (ম্যান্ডেট)–এর অধিকারী নয়। এর বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে পালটা যুক্তি তুলে ধরা হল যে, প্রস্তাবিত অন্যান্য সাংবিধানিক সংশোধনীর মতো একইভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করার ক্ষেত্রেও ডাক ও আইয়ুবের পার্লামেন্ট যথেষ্টই উপযোগী।

ইতিমধ্যে আমি ভেবে দেখলাম যে, বিশেষজ্ঞ দলটির সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের যুক্ত করে এর শক্তিবৃদ্ধি করা হলে কার্যক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। ঐ সময় ইসলামাবাদে কর্মরত অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমানকে লাহোরে গিয়ে বিশেষজ্ঞ দলে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হল। অধ্যাপক ওয়াহিদুল হকও তখন ইসলামাবাদে ছিলেন। পরদিন ইসলামাবাদ থেকে অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে সঙ্গে করে অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং ঢাকা থেকে ড. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী লাহোরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ডাক-এর সাবকমিটিতে অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় মওলানা মওদুদি, মমতাজ দৌলতানা ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলিসহ পাঞ্জাবি নেতারা ৮ মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের কক্ষে এসে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ডাক-এর অভিন্ন দাবিনামার অংশ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু শেখ মুজিব তাঁর অবস্থানে অটল রইলেন। তিনি আবারও জানিয়ে দিলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচি ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করতে না পারলে তিনি এবং তাঁর দল গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন না। কয়েকজন পাঞ্জাবি নেতা যখন যুক্তি দেখালেন যে ছয়দফা কর্মসূচি কাজে পরিণত করার উপযোগী নয়, তখন শেখ মুজিব বললেন তিনি সঙ্গে করে একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা পাঞ্জাবি নেতাদের মনোনীত যে-কোনো বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে বসে ছয়দফা কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন। এই পর্যায়ে আমাদের ডাকা হল। চৌধুরী মোহাম্মদ আলি ভান করলেন যে বিষয়গুলো তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠা 'খুবই জটিল' এবং বললেন যে তাঁদের পক্ষ অনেক বিশেষজ্ঞ রাখার মতো 'যথেষ্ট ভাগ্যবান' নয়।

অনমনীয় পাঞ্জাবি নেতারা অভিন্ন দাবিনামায় ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সূত্র অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁদের অস্বীকৃতিতে অনড় থাকায় আলোচনায় সংকট দেখা দিল। আপোসহীন শেখ মুজিব জানিয়ে দিলেন, ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত করা না হলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে রাওয়ালপিন্ডি রওনা হওয়ার পরিবর্তে পরদিন সকালে তিনি ঢাকায় ফিরবেন। পাঠান ও বালুচ নেতারা ছয়দফা দাবির অন্তর্ভুক্তি সমর্থনে প্রস্তুত ছিলেন এবং এক ইউনিট বিলোপে তাঁদের দাবির পক্ষে বাঙালিরা যে সমর্থন দিচ্ছিল তার প্রশংসা করছিলেন। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গ্রহণকারী এয়ার মার্শাল আসগর খানের সঙ্গে ৮ মার্চ সন্ধ্যার পরও বিশদ আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত এরকম একটি আপোস ফর্মুলা বের করা হল যে, সামগ্রিকভাবে কমিটি (ডাক) একটি ন্যূনতম অভিন্ন দাবিনামা উত্থাপন করবে, তবে কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেক দলই তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া আলাদাভাবে তুলে ধরার স্বাধীনতা পাবে। ফলে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে তাঁদের দাবি উত্থাপনের সুযোগ পাবেন। এই সমঝোতার ভিত্তিতেই অবশেষে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হলেন।

ছয়দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে একটি বিশদ বিবৃতি তৈরি করার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিয়ে শেখ মুজিব ৯ মার্চ সকালে সড়কপথে রাওয়ালপিন্ডি রওয়া হলেন। সারাদিন ধরে আমরা খসড়াটি তৈরি করলাম এবং ঐদিনই সন্ধ্যায় সেটি রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হল। ঐ বিবৃতিতে শেখ মুজিব একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদীয় গণতন্ত্র (ফেডারেল পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি) প্রতিষ্ঠা এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অভিন্ন দাবি তুলে ধরার পাশাপাশি ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। বিবৃতিতে ছয়দফা কর্মসূচির প্রতিটি দাবিই যথাযথ স্পষ্টভাবে এবং বিশেষজ্ঞ দলটির দ্বারা সূত্রবদ্ধ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে তুলে ধরা হয়। বিবৃতিতে পশ্চিমাঞ্চলে এক ইউনিটের বিলোপ সমর্থন করে দাবি করা হয় যে কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব

থাকবে অঞ্চলগুলোর জনসংখ্যার অনুপাতে এবং এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে। গভীর ও আন্তরিক আলোচনায় আওয়ামী লীগের সদিচ্ছার প্রকাশ হিসেবে শেখ মুজিব ছয়দফা কর্মসূচিভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সম্ভাব্য ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পক্ষের মনোনীত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর নিজের বিশেষজ্ঞদলটি এ–ধরনের আলাপ–আলোচনার জন্যে আগাগোড়া প্রস্তুত ছিল। বিশেষজ্ঞদের কোনো কমিটি যদি গঠিত হয় তা হলে ঐ কমিটির আলাপ–আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে যে–বিশেষজ্ঞরা গিয়েছিলেন তাঁদের পাশাপাশি পাকিস্তান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের তৎকালীন পরিচালক ড. নুরুল হুদাকেও প্রস্তুত ও অপেক্ষমান রাখা হয়েছিল।

রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে আমি জানতে পারলাম যে মঞ্জুর কাদেরও সেখানে রয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন, আইয়ুব খান তাঁকে একজন উপদেষ্টা হিসেবে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্যে রাওয়ালপিন্ডিতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যখন তাঁকে বললাম গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ–আলোচনা চালানোর জন্যে শেখ মুজিব একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, তখন মঞ্জুর কাদের ঐ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করলেন যে, ঐ ধরনের কমিটি গঠিত হবে এবং সেক্ষেত্রে তিনি সরকারপক্ষ থেকে কমিটিতে থাকার ইচ্ছা রাখেন।

কিন্তু এর পরও দেখা গেল, পাঞ্জাবিরা নিজেদের মধ্যে এই প্রশ্নে একাট্টা যে, গোলটেবিল বৈঠকে ছয়দফা কর্মসূচি কোনোভাবেই আলোচিত হতে দেয়া যাবে না। জানা গেল, পাঞ্জাবি বিরোধীদলীয় নেতারা আইয়ুব ও তাঁর আইনমন্ত্রী জাফরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বস্তুত গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুব নিজে ছয়দফা প্রশ্নে আপত্তি তোলার আগেই চৌধুরী মোহাম্মদ আলি তাঁর উদ্বোধনী বিবৃতিতে বলে দিলেন যে, একটি ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকারের জন্যে ডাক–এর দাবিতে পাকিস্তানের দুই অংশের সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তন বা পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের বিভাজন চাওয়া হয়নি। তিনি এই যুক্তিও দেখালেন যে গোলটেবিল বৈঠক এ–ধরনের প্রশ্ন আলোচনার উপযোগী নয়।

তৎকালীন প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী ড. নুরুল হুদা আইয়ুবের দলের একজন সদস্য হিসেবে বৈঠকে অংশ নিচ্ছিলেন। তবে তিনি আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং সরকারপক্ষে কী ঘটছে না–ঘটছে সে–সম্পর্কে কিছু 'ভেতরের খবর' সরবরাহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যমতে সরকারপক্ষে উল্লেখযোগ্য রকমের মতভেদ বিরাজ করছিল। সেখানে 'চরমপন্থি'রা (The hawks) স্বায়ত্তশাসনের দাবি বা এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার প্রশ্নে কোনোরকমের নতিস্বীকারেই রাজি ছিলেন না এবং এমনকি তাঁরা ঐসব বিষয় আলোচনার জন্যে বিশেষজ্ঞদের কোনো কমিটি গঠনেরও বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে 'নরমপন্থি'রা (The doves) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয় আলোচনার জন্যে বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। জাফর এবং এ আর খান ছিলেন 'চরম'দেব দলে—দোহা

ছিলেন তাদের সমর্থক। ড. হুদা জানিয়েছিলেন যে তিনি নিজে এবং মঞ্জুর কাদের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

আমিও মঞ্জুর কাদেরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম। ১১ মার্চ আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, মঞ্জুর কাদের বললেন যে, তিনি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সমর্থক। এরপর তিনি উল্লেখ করলেন যে তিনি ছয়দফা দাবি পরীক্ষা করে দেখছেন এবং দুটি পৃথক মুদ্রাসংক্রান্ত দফাটি তাঁর কাছে জটিল মনে হয়েছে। যখন তাঁকে বলা হল যে বৈঠকে উত্থাপিত বিবৃতিতে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের আওতায় একটি অভিন্ন মুদ্রা রাখার বিকল্প প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়েছে তখন মঞ্জুর কাদের বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কারণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তাঁকে যে–নকল সরবরাহ করা হয়েছে তাতে ঐ বিকল্প প্রস্তাবের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। আমি তাঁকে জানালাম যে, শেখ মুজিব একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন এবং তার অনুলিপিও বিতরণ করা হয়েছে ; কাজেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সরবরাহ করা নকলে এরকম একটি গুরুতর ভুল থাকার কোনো সুযোগই থাকে না। মঞ্জুর কাদের শঙ্কা প্রকাশ করলেন এবং শেখ মুজিবের বিবৃতির একটি অনুলিপি তাঁকে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। অনুলিপি যোগাড় করে তাঁকে দেয়া হল। ১১ মার্চেই জানা গেল, সরকারপক্ষের মনোভাব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নের বিশদ আলোচনা এবং একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দিকে ঝুঁকছে। পরদিন, ১২ মার্চ আইয়ুব তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছিল।

কিন্তু ১২ মার্চ গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই ঘটল না। অ্যাডমিরাল এ আর খান ও এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাক–বিতণ্ডায় দিনটি পেরিয়ে গেল।

তবে ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে ড. হুদা এবং অন্যদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে সরকার পক্ষে 'চরম'রাই প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। এরপর সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল, ঐ রাতেই এক বৈঠকে স্বায়ত্তশাসনবিরোধী ব্যক্তিরা অর্থাৎ পাঞ্জাবি নেতারা এবং সরকারপক্ষের 'চরমপন্থি' অংশটি একসাথে মিলিত হয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার প্রশ্নে যে–কোনো ছাড় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৩ মার্চ আইয়ুব এক বিবৃতি পড়লেন যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে 'চরম' অংশটিই তাঁর ওপর ভর করেছে। আইয়ুবকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। এইসব আলাপ–আলোচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন একজন কর্মকর্তার মতে, তখন কৌশল–নির্ধারণে আইয়ুবের খুব কমই স্বাধীনতা ছিল, কারণ ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া এবং সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এবং পর্দার আড়ালে বসে তারাই কলকাঠি নাড়ছিল। প্রকৃত ক্ষমতাধর হিসেবে সেনাবাহিনীর আবির্ভাব পরিষ্কার হয়ে গেলে ১২ মার্চ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গেও এক পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ঐ বৈঠকে শেখ মুজিব ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ব্যাপারে বাঙালিরা যে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তা ইয়াহিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ইয়াহিয়া সহনশীলতার ভান করেন এবং পরোক্ষ ইঙ্গিত দেন যে

রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে ছয়দফা দাবির বিরুদ্ধে 'অস্ত্রের ভাষা'য় জবাব দেয়ার মনোভাব পোষণ করে আইয়ুব ও মোনেম খান ভুল করেছেন। আসলে ইয়াহিয়ার দিক থেকে ঐ বৈঠক ছিল তাঁর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশের প্রস্তুতির অংশবিশেষ। যদিও তিনি ভান করছিলেন যে, তিনি গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনার সাফল্য কামনা করেন, আসলে তিনি চাইছিলেন আলোচনা ব্যর্থ হোক এবং ঐ ব্যর্থতা সুনিশ্চিত করার জন্যে তিনি সেনাবাহিনীর দিক থেকে চাপও বজায় রেখেছিলেন। কারণ, আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াটা তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পরিস্থিতি তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল।

বৈঠকে আইয়ুব কার্যত একটি একতরফা রোয়েদাদ (Award) ঘোষণা করলেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলি এবং অন্যান্য পাঞ্জাবি নেতার উথাপিত যুক্তির প্রতিধ্বনি করে আইয়ুব তাঁর বিবৃতিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কিংবা এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার দাবিতে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (এ ফেডারেল পার্লামেন্টারি ফর্ম অভ গভর্নমেন্ট) গঠন এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তিনি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ নেবেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনায় আইয়ুব তাঁর অক্ষমতাকে যুক্তিসঙ্গত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেন এই বলে যে, এগুলো হল মৌলিক প্রশ্ন যা কেবল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই বিবেচনা করতে পারেন। পরবর্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে (আইয়ুব এবং পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দের) ঐ অবস্থান গ্রহণ ছিল পুরোপুরিই কৌশলগত, কারণ ২১ মাস পরে যখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি সংস্থা (১৯৭০-এ নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ) অবশেষে গঠিত হয় তখন একই পাঞ্জাবি নেতারা যুক্তি দেখান যে ঐ সংস্থার পক্ষে বিবেচনার জন্যে বিষয়গুলো খুবই 'মৌলিক' ধরনের এবং সংস্থা-বহির্ভূত একটি গোলটেবিল বৈঠকে সেসবের মীমাংসা হওয়া উচিত। আইয়ুব তাঁর ঘোষণা পড়ে শেষ করতে-না-করতেই পাঞ্জাবি নেতারা অন্যান্য ডাক-সদস্যের সঙ্গে, এমনকি কোনো লোক-দেখানো আলাপ-আলোচনার অপেক্ষা না করেই, আইয়ুবকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যেহেতু এটা তখন পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, স্বায়ত্তশাসনবিরোধী শক্তি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার দরজা বন্ধ করে দেয়ার কাজে সফল হয়েছে—শেখ মুজিব আইয়ুবের রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্মেলনকক্ষ থেকে ফিরে শেখ মুজিব পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণে তাঁর শীর্ষস্থানীয় সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। বেলা তিনটায় এক সংবাদ-সম্মেলন ডাকা হল। সংবাদ-মাধ্যমগুলোর জন্যে আমাকে একটি বিবৃতি তৈরি করতে বলা হল, যার মুখ্য বিষয়—আইয়ুবের রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান, ডাক থেকে প্রত্যাহার এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করল। একদিকে খবর আসতে লাগল, যার একটিতে মঞ্জুর কাদের আমাকে জানালেন, আলোচনা আবার শুরু করা যায় কি না সে-ব্যাপারে তখনও চেষ্টা চলছে—অন্যদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

সংবাদ–সম্মেলনে শেখ মুজিব ডাক থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার এবং গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় ডাক–এর বিলুপ্তি ঘোষিত হল।

শেখ মুজিব তাঁর সিদ্ধান্তে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশ্যে ঢাকায় টেলিফোন করলেন। তিনি সঠিকভাবেই পরিমাপ করেছিলেন যে, আইয়ুবের রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত জনগণ সমর্থন করবে। বাঙালি জনগণের প্রতিক্রিয়া হল ত্বরিতগতিতে। আইয়ুব, পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ ও আইয়ুবের ঘোষণায় মৌন সম্মতিদানকারী বাঙালি নেতাদের নিন্দা এবং ছয়দফা আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকায় তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হল। আর এইসব বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণের সত্যিকারের এবং একচ্ছত্র মুখপাত্র হিসেবে শেখ মুজিবের অবস্থান আরও দৃঢ় হল।

আইয়ুব উপলব্ধি করলেন যে, পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি এবং জনগণের ওপর অপরাপর বাঙালি নেতাদের তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই, কাজেই তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা অর্থহীন। সম্মেলন (গোলটেবিল বৈঠক) ভেঙে যাওয়ার পরপরই আইয়ুব শেখ মুজিবের সঙ্গে এক বৈঠকে বসলেন এবং ছয়দফা দাবি মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতার পক্ষে কারণ দেখালেন যে, ছয়দফাকে কার্যকরতা দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনীগুলো জাতীয় পরিষদে পর্যাপ্ত সমর্থন পাবে না। জবাবে শেখ মুজিব বললেন, বাঙালি জনগণের মধ্যে বিরাজমান মনোভাবের কারণে, ঐ ধরনের সংশোধনী উত্থাপিত হলে সকল বাঙালি সদস্যই তা সমর্থন করবে। আইয়ুব তখন আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, সংশোধনীগুলো সূত্রবদ্ধ করতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। শেখ মুজিব নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিন সপ্তাহর মধ্যেই খসড়া সংশোধনীগুলো সরবরাহ করা যাবে।

ঐ বৈঠক থেকে ফিরেই শেখ মুজিব তাঁর উপদেষ্টাদের ডাকলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। ঢাকায় ফিরে উপদেষ্টা দলটি ছয়দফা কর্মসূচি ও এক ইউনিট ভেঙে দেয়াকে কার্যকরতা দেয়ার জন্যে তিন সপ্তার মধ্যে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলো প্রণয়নে দিনরাত কাজ করতে লাগল। সিদ্ধান্ত হল যে, ঐসব সংশোধনী নিয়ে একটি সংবিধান–সংশোধন–বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করবেন আওয়ামী লীগ সদস্যরা। সংশোধনীগুলো তৈরি হওয়ার পর তার প্রতিলিপি নিয়ে কামরুজ্জামান রাওয়ালপিন্ডি গেলেন। ২২ মার্চ আইয়ুবকে (সম্ভাব্য সংবিধান সংশোধন বিলের) একটি অগ্রিম প্রতিলিপি দেয়া হল। কিন্তু জাতীয় পরিষদে ঐ সংশোধনী বিবেচনার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে আইয়ুব পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন এই কারণ দেখিয়ে যে, দেশের বিভাজনপ্রক্রিয়ায় তিনি সভাপতিত্ব করতে চান না। আইয়ুবের কাছ থেকে ক্ষমতা নেয়ার জন্যে যিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই ইয়াহিয়া খান ক্ষমতার মঞ্চে প্রবেশ করলেন। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল, জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত ও সামরিক আইন জারি করা হল (২৫ মার্চ ১৯৬৯)।

গণআন্দোলনের ফলে হুমকির সম্মুখীন ক্ষমতাকাঠামো রক্ষার দায়িত্ব উত্তরাধিকার–সূত্রে ইয়াহিয়ার ওপর বর্তাল। সামরিক আইন জারি করে ইয়াহিয়া হাতে কিছু সময় নিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম ভাষণে ইয়াহিয়া নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা–হস্তান্তরের অঙ্গীকার করলেন। এর পরপরই তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। শেখ মুজিব একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের একমাত্র সঠিক পথ এবং অবশ্যই বাঙালি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ (সংবিধান–সভা) গঠনের প্রস্তাব করলেন—যাতে প্রতিনিধিত্ব থাকবে জনসংখ্যার অনুপাতে। পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইউনিটগুলোর একত্রিত থাকার কোনো সম্মত ভিত্তি ছাড়াই বাইশ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশরা একটি সার্বভৌম গণপরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। ১৯৫৪ সালে পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে ঐ গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় এমন পরিস্থিতিতে যাতে যে–পরিষদে সেটি গৃহীত হয় তার প্রতিনিধিত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এ–ব্যাপারে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, সামরিক আইন জারির হুমকি দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে এক ইউনিট, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সমতা এবং কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট বিভাজনের বিষয়গুলো ঐ পরিষদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র জারি করা হয়েছিল প্রেসিডেন্টের ফরমান বলে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সঠিকভাবে নির্বাচিত একটি গণপরিষদ গঠনের দাবিটি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাঙলায় নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম দাবি ছিল। এই মৌলিক বিষয়টি আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নির্ধারণ করবে পাকিস্তানের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক ইউনিটগুলোর একত্রিত থাকার ভিত্তি। পাকিস্তান শাসন করার কোনো বৈধ ভিত্তি পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীর ছিল না। পরিহাসের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে গণহত্যার পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, ক্ষমতাদস্যু ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠান ছিল অসাংবিধানিক।

যে–পাঞ্জাবি নেতারা আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মতো মৌলিক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কেবল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই, তাঁরা এখন সুর পালটালেন। তাঁদের কেউ–কেউ কিছু সংশোধনীসহ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্বহালের জন্যে চাপ দিতে শুরু করলেন, যেসব সংশোধনী নির্ধারিত হবে রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠকে সমঝোতার মাধ্যমে। অন্যেরা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের মতো, জারি করা এক শাসনতন্ত্রের বায়না ধরলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে–কোনো জাতীয় কাঠামোতে ভোটযুদ্ধে সংখ্যালঘু পাঞ্জাবিদের পরাস্ত হওয়ার দুঃস্বপ্ন পাকিস্তান–প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই তাদের তাড়া করে ফিরছিল। পাঠান, বেলুচ ও সিন্ধিদের বড় অংশ অবিলম্বে এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার জন্যে চাপ দিতে একজোট হল।

ইয়াহিয়া উপলব্ধি করলেন যে, জনগণের বিক্ষোভের মুখে অনির্দিষ্টকালের জন্যে নগ্ন সামরিক শাসন চালানো যাবে না। অতএব দেশের উভয় অংশের চাপ মোকাবেলা ও নিজের শাসনকে বৈধতা দিতে কোনো-না-কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়াটা ইয়াহিয়ার জন্যে জরুরি হয়ে পড়ল। ইয়াহিয়ার আসল দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল পূর্বাঞ্চল, যেখানে উত্তাল বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমগ্র জনগণকে একক এক নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করেছে। শেখ মুজিব পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অথবা কোনো ফরমানবলে চাপিয়ে-দেয়া যে-কোনো শাসনতন্ত্রই বাঙালি জনগণ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি আরও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাঙালিরা কেবল সে-রকম একটি শাসনতন্ত্রই মেনে নেবে যা জনসংখ্যার অনুপাতে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি গণপরিষদ (বা সংবিধান-সভা) কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত হবে। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে ভীত পাঞ্জাবি সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর ওপরই ভর করতে লাগল। তারা সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করছিল যে, গণপরিষদ এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে পারে যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে—বিশেষত অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা। অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা ব্যয় ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া সামরিক বাহিনীও নিঃসন্দেহে একই রকম দুর্ভাবনায় পড়েছিল।

এরকম পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া আপাতদৃষ্টিতে কিছু ছাড় দিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন যে, একটি গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি একটি আইনগত রূপরেখা (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) ঘোষণা করবেন। তিনি এক ব্যক্তি-এক ভোট অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের নীতি মেনে নেয়ার কথা বললেন। এর ফলে পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি পাবে। তিনি এক-ইউনিট ভেঙে দেয়ার পক্ষে তাঁর সিদ্ধান্তের কথাও বললেন। এক-ইউনিট সংক্রান্ত এই ছাড় স্পষ্টতই পশ্চিমাঞ্চলে বিরোধের প্রধান বিষয়টির নিষ্পত্তি এবং এর দ্বারা সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের এক ইউনিট বিরোধী শক্তিগুলোকে পরিষদে বাঙালিদের সঙ্গে যোগ দেয়া থেকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত। অতএব, পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধভাবে বাঙালিদের মোকাবেলার ক্ষেত্র পরিষ্কার হল। তবে হিসেব-কষা এক ঝুঁকি (a calculated risk) অবশ্য নেয়াই হল যে, বাঙালি প্রতিনিধিরা জোটবদ্ধভাবে ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে পারে।

সন্দেহ নেই, এটা ছিল ইয়াহিয়ার প্রধান উদ্বেগের অন্যতম কারণ। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ঘোষিত আইনগত রূপরেখা আদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারায় ঐ উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় এবং তাতে ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষাকারী রূপে সেনাবাহিনীর ভূমিকা আবারও ফুটে ওঠে। আইনগত রূপরেখার অনুচ্ছেদ ২০-এ বলা হয়, শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে পাঁচটি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে। এর চতুর্থ নীতিটি নিম্নরূপে সূত্রবদ্ধ হয় :

আইন প্রণয়নমূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ আইন প্রণয়নমূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে, তবে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক সংহতি রক্ষায় আইন প্রণয়নমূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেও পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে।

রূপরেখার অনুচ্ছেদ ২৫-এ বিধান রাখা হয় যে, শাসনতন্ত্র বিল অনুমোদনের (Authentication) জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানালে গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বিধানকে বাঙালিরা সংখ্যালঘু পাঞ্জাবিস্বার্থের আনুষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং সার্বভৌম গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা গৃহীত যে-কোনো সিদ্ধান্তে সেনাবাহিনীর ভেটো দেয়ার ক্ষমতার সংরক্ষণরূপে গণ্য করল। শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, যদিও তিনি এক ব্যক্তি-এক ভোটের ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠনকে স্বাগত জানান, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, ঐ পরিষদ হবে সার্বভৌম এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এর ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনগত রূপরেখার ২০ ও ২৫ অনুচ্ছেদের দ্বারা একে শৃঙ্খলিত করা চলবে না। তিনি ঐসব বিধান বাতিলের দাবি জানিয়ে বললেন যে, যে-কোনো দিক থেকে বিবেচনা করা হোক-না কেন, জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালানো অবৈধ ও অকার্যকর।

ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর হিসেবে যথেষ্ট সতর্কতা ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের লক্ষ্য ছিল ছয়দফা-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে বাঙালির দাবির বিরুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি আরও বিধান জারি করেছিলেন যে, গণপরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারলে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্যে তা জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট)-এ রূপান্তরিত হবে, তবে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হলে গণপরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। এই বিধানের লক্ষ্য ছিল দ্রুত একটি আপোসে উপনীত হতে প্রতিনিধিদের ওপর জোর চাপ বহাল রাখা এবং আশা করা হচ্ছিল যে, এর ফলে স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রশ্নে ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘুদের বিবেচনায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সীমার মধ্যেই আপোসরফাটি অর্জিত হবে। আর তা যদি নেহাত না-ই হয়, তা হলে অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষমতা তো প্রেসিডেন্টের হাতে রইলই। এ ছাড়া ইয়াহিয়ার ধারণা ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো দলই সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অন্য কথায়, বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খণ্ডিত হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার ও দলে ভেড়ানোর মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করার ও সুবিধাজনক অবস্থা বাগিয়ে নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাবেন। পঞ্চাশের দশক জুড়ে ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এই কৌশলটিরই সফল ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে এবং ইয়াহিয়াও আশান্বিত ছিলেন যে, কৌশলটি তাঁর জন্যেও

একইরকম কাজ করবে। অন্যদিকে হামিদুল হক চৌধুরীর মতো প্রবীণ বাঙালি রাজনীতিকের কাছ থেকে পাওয়া এরকম খবরেও ইয়াহিয়া উৎসাহিত বোধ করছিলেন যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে তেমন ভালো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না।

কিন্তু নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলতে থাকাকালে ক্রমেই পরিষ্কার হতে লাগল যে, দল হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রায় সর্বজনীন সমর্থন নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। অন্য দলগুলো উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, এমন গণজোয়ার জেগে উঠছে যা আওয়ামী লীগকে বিপুল ও সুদূরপ্রসারী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অধিষ্ঠিত করতে পারে। কাজেই তারা নির্বাচন–পরিকল্পনা স্থগিত করার দাবি জানাতে শুরু করল।

নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত ছিল ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর। আগস্ট মাসের দিকে বন্যা দেখা দেয়ায় নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন দলের নেতাদের চাপসৃষ্টির সুযোগ তৈরি হল। তাঁরা ভেবেছিলেন নির্বাচন বিলম্বিত হলে তাঁরা নিজেদের পক্ষে কিছুটা ভিত্তি দাঁড় করাতে পারবেন। তাঁদের স্থগিতকরণ প্রচেষ্টা সফল হল। নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারিত হল ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০। তবে এই স্থগিতকরণ প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের জন্যেই সহায়ক হল। বাড়তি সময় শেখ মুজিবকে আরও বেশি সফর করতে এবং বাংলাদেশের সকল অংশের মানুষের কাছে যেতে সাহায্য করল। উপরন্তু ঐ বাড়তি সময়ের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল যা জনগণের ওপর এবং অবশেষে নির্বাচনী ফলাফলের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলল। ঘটনাটি ছিল ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস।

ধ্বংস ও মৃত্যুর ব্যাপকতা ঐ মহাবিপর্যয়কে সারা বিশ্বের সংবাদ শিরোনামে পরিণত করলেও ইয়াহিয়া ও তাঁর কেন্দ্রীয় সরকার এর প্রতি যে–চরম ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা দেখালেন তা দেশে ও বিদেশে সকলের চোখেই ধরা পড়ল। ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই চীন থেকে ফেরার সময় ইয়াহিয়া ঢাকায় যাত্রাবিরতি করলেন, কিন্তু (পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখতে, পরিমাপ করতে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে) এখানে অবস্থান করলেন না। সরকার পরিচালিত ত্রাণ–তৎপরতা ছিল মন্থর ও অপর্যাপ্ত। এই ঘটনাটিও শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে এ–ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় যোগ্যতা প্রমাণের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের আহত অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ এনে দিল।

অন্য দলগুলো আবারও সমস্বরে নির্বাচন পেছানোর দাবি তুলল। আওয়ামী লীগ নির্বাচন পেছানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাল। শেখ মুজিব নির্বাচন পেছানোর চেষ্টাকে ক্ষমতা–হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করে হুঁশিয়ারি দিলেন যে, জনগণ ঐ চক্রান্ত প্রতিহত করবে। শেখ মুজিব বললেন, দশ লাখেরও বেশি মানুষের জীবনহানি ঘটেছে (ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক প্লাবনে), প্রয়োজন হলে আরও দশ লাখ বাঙালি জীবন দেবে, কিন্তু চক্রান্তকারীদের প্রতিহত করে জনগণ এবার ক্ষমতায় যাবেই—যাতে নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ–ধরনের পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া নির্বাচন আরও পেছানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। কেবল ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত এলাকার ১৭টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হল। অন্যান্য স্থানে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

৩১৩ আসনের পরিষদে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হল। শেখ মুজিবকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে এই চূড়ান্তভাবে নির্ধারক নির্বাচনী ফলাফল ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও তাঁর ছয়দফা কর্মসূচির পক্ষে জনগণের সুস্পষ্ট রায়। নির্বাচনের এ হেন ফলাফল ইয়াহিয়ার গোটা কৌশলকে মারাত্মক বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করল। ইয়াহিয়া স্পষ্টতই পূর্বপাকিস্তানে বিভক্ত প্রতিনিধিত্বের ভরসায় ছিলেন, যাতে তিনি ইচ্ছা মতো প্রভাব বিস্তার ও কূটকৌশল প্রয়োগ করে পরিস্থিতি বাগে নেয়ার সুযোগ পান। কিন্তু এখন তাঁকে এক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুখোমুখি হতে হল। ইয়াহিয়া উপলব্ধি করলেন যে, উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ তাঁর হাতের পুরোপুরি বাইরে চলে গেছে এবং কৌশলে কার্যোদ্ধারের ক্ষমতাও তিনি পুরোপুরিই হারিয়েছেন। কোথায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানে এক খণ্ডিত ও বিরোধপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের কল্পনা করেছিলেন, আর কোথায় তাঁকে দাঁড়াতে হল এক একক ও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে! ইয়াহিয়ার হিসেব কেবল তাঁর নিজের অনুমান–নির্ভরই ছিল না, যে–পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিদেশি নেতাদের সঙ্গে ইয়াহিয়া শলাপরামর্শ করেছিলেন তাঁরাও তাঁকে জোরের সাথে ঐরকম ধারণাই দিয়েছিলেন।

নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ভুট্টোর দল ৮৩টি আসনে জয়ী হল, আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল কেবল সিন্ধু ও পাঞ্জাবে। এই ফলাফলে ভুট্টোর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ করার মতো। নির্বাচনের অব্যবহিত পরে তাঁর প্রথম বিবৃতিতে ভুট্টো বললেন, তার পিপলস পার্টির সম্মতি ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র তৈরিই হতে পারে না। ভুট্টো জোর দিয়ে বললেন যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাবই হল "ক্ষমতার দুর্গ"। এর পরপরই আরেক বিবৃতিতে তিনি বললেন, "কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই জাতীয় রাজনীতির নির্ধারক নয়।" এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, জাতীয় পরিষদে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কোণঠাসা রাখতে ভুট্টো পরিষদের বাইরে সংঘাতে লিপ্ত হওয়াকেই একমাত্র উপায় গণ্য করেছিলেন। কারণ ভুট্টো ঠিকই জানতেন, পরিষদের বাইরে সংঘাতে তিনি শক্তির সেই বিশেষ উৎসটি থেকে মদদ পাবেন, বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে দমিকে রাখতে ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘুরা যে–উৎসকে সবসময় ব্যবহার করে এসেছে। শক্তির সেই উৎসটি ছিল সেনাবাহিনী। ভুট্টোর এই কৌশল ছিল পুরোনো সেই একই কৌশল যা পাকিস্তান আমলের ২৪ বছর ধরেই চলে আসছিল। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মোকাবেলায় অক্ষম ক্ষমতালোভী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সর্বদাই শেষ উপায় হিসেবে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুট্টোর ভেটো–ক্ষমতার দাবি আওয়ামী লীগ মেনে নেবে কেন? এ পর্যায়ে ইয়াহিয়া আপাতদৃষ্টিতে আপোস–মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারীর অবস্থান নিলেও ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ দেখা গেল,

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে ছয়দফা কর্মসূচিতে রদবদলের জন্যে চাপ দেয়ার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া নিজেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাদানুবাদে নিজের পৃথক ও প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু করেছেন। এতে যদি তিনি সফল হতেন তা হলে হয়তো ইয়াহিয়া অন্যান্য পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে জোট বাঁধতেন এবং ভুট্টো হয়তো নিজেকে সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন দেখতে পেতেন।

ইয়াহিয়া যখন সম্ভবত এ–ধরনের চিন্তাভাবনা করছিলেন, ভুট্টো তখন জেনারেলদের একটি অংশের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের একজনের প্রকাশিত ভাষ্যে পরে জানা গেছে, ভুট্টোর একজন গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্টের পিএসও (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) জেনারেল পীরজাদা। সম্ভবত জেনারেল গুল হাসানসহ আরও কয়েকজন, যারা ১৯৭১ সালের শেষনাগাদ ভুট্টোর ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিচালিত শুদ্ধি–অভিযান থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরাও ঐ গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঐ সময় তাঁদের মনোভাব কী ছিল তা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেন ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউসের এক ব্যয়বহুল নৈশভোজে যোগ দিতে এসে ঐ গ্রুপের এক জেনারেল। আরেকজন পাকিস্তানি সামরিক অফিসার পরে বলেছেন, ঐ জেনারেল সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, "চিন্তা কোরো না, আমরা এইসব কালো হারামজাদাদের আমাদের ওপর শাসন চালাতে দেব না।"

১৯৭১–এর জানুয়ারির মাঝামাঝি ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে এক প্রাথমিক বৈঠকে ইয়াহিয়া আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট সমঝোতামূলক মনোভাব দেখালেও ছয়দফা কর্মসূচির ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাইলেন। বস্তুত এভাবেই তিনি ছয়দফার ওপর আলাপ–আলোচনা শুরুর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ইয়াহিয়ার একজন উপদেষ্টা স্মৃতিচারণ করেছেন যে, ছয়দফার অন্তর্নিহিত অর্থ ও ফলাফল সম্পর্কে ইসলামাবাদে ইতিমধ্যেই বিশদ পর্যালোচনা হয়ে গিয়েছিল এবং ডিসেম্বরে এমনকি একটি খসড়া শাসনতন্ত্রও প্রস্তুত করা হয়েছিল। কাজেই, ছয়দফার ব্যাপারে ব্যাখ্যার অনুরোধটি ছিল কার্যত ছয়দফার মর্মবস্তুর ওপর আলোচনার জন্যে একটি নম্র আমন্ত্রণ। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ এরকম আলোচনায় যাওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না। জুন মাসেই শেখ মুজিব নির্বাচনকে ছয়দফা প্রশ্নে গণভোট বলে ঘোষণা করেছিলেন। জনগণের রায় ছিল চূড়ান্ত ও নির্ধারক। জানুয়ারির গোড়ায় ঢাকায় এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ছয়দফা' এখন জনগণের সম্পত্তি এবং ছয়দফা প্রশ্নে আপোসের কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই।

ঐ জনসভায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সকল আওয়ামী লীগ সদস্য শপথ নিয়েছিলেন যে, ছয়দফার ব্যাপারে তাঁরা আপোস করবেন না। শেখ মুজিব ও তাঁর শীর্ষ সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানের সঙ্গে ইয়াহিয়া বৈঠক করলেন। তাঁরা ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁরা ইয়াহিয়াকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন যে, ছয়দফা কর্মসূচি কার্যে পরিণত করার উপযোগী এবং তা এমনভাবে চালু করা হবে যাতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের জন্যে

কেন্দ্রের হাতে সীমিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকে এবং ঐসব দায়িত্ব পালনের জন্যে কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সম্পদের নিশ্চয়তাও দেয়া হয়। ইয়াহিয়াকে জানানো হল যে, শাসনতান্ত্রিকভাবে এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে যাতে কেন্দ্রের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কেন্দ্রের হাতে চলে যায়। ফলে কেন্দ্রকে অঞ্চলগুলোর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

ঐ বৈঠকের পর শেখ মুজিব আমাকে পৃথকভাবে পীরজাদার সঙ্গে বৈঠসে বসতে এবং ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দিলেন। বৈঠকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, কেন্দ্রের জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্বের সংস্থানই তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয়। অঞ্চলগুলোর দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশিত হল। এর বিপরীতে আমি জানালাম, শাসনতান্ত্রিক বিধান এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যাতে সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্বের একটি অংশ নিজে থেকেই (automatically) কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে বোঝালাম যে, এসব ব্যাপারে অঞ্চলগুলো দেশের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা অনুযায়ী আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে। এটাও উল্লেখ করলাম যে, এসব প্রশ্নে সম্ভবত কোনো বিরোধ দেখা দেবে না, কেননা কেন্দ্র ও পূর্ব পাকিস্তান উভয়ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগই সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। পীরজাদা অঙ্গীকারহীন অবস্থান গ্রহণ করলেন, তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বললেন, ইয়াহিয়াকে তো পশ্চিম পাকিস্তানকেও সঙ্গে নিতে হবে (to carry with), কাজেই ভুট্টোর সঙ্গে আওয়ামী লীগ একটি সমঝোতায় পৌছুক সেটাই প্রত্যাশিত।

তিনি বললেন, পরিষদে আওয়ামী লীগ এবং একই সঙ্গে পিপলস পার্টির দ্বারা সমর্থিত শাসনতন্ত্রই ক্ষমতা–হস্তান্তর ত্বরান্বিত করবে। পীরজাদার সমাপনী উক্তিতে মনে হল, ভুট্টো, পীরজাদা এবং সেনাবাহিনীর অন্তত একটি অংশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, ঢাকা থেকে উড়ে ইয়াহিয়া সরাসরি লারকানা গেলেন (ভুট্টো পরিবারের বাড়ি সিন্ধুর লারকানায়) যদিও বলা হল যে এটা ছিল এক মৃগয়া সফর। ক্ষমতাসীন জান্তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ, বেশ কয়েকজন জেনারেলও, বিমানে করে লারকানা পৌছলেন এবং সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল—ভুট্টো তাঁর 'গ্রেট ট্র্যাজেডি' বইয়ে একথা স্বীকার করেছেন। সন্দেহের অবকাশ খুবই কম যে, নির্বাচনে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভ্যুদয়কে কীভাবে মোকাবেলা ও ব্যর্থ করে দেয়া যায় সে কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছিল। ঘোষণা করা হল যে, ভুট্টো শিগ্‌গিরই ঢাকা সফর করবেন। অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাও ঢাকায় আসতে শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নওয়াব আকবর খান বুগতি, মওলানা নূরানি ও সরদার শওকত হায়াত খান।

ভুট্টো ঢাকায় এলেন ২৭ জানুয়ারি। শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হল। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ দলের (team) সঙ্গে পিপলস পার্টি দলের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হল। পিপলস পার্টির পক্ষে আলোকচদের দলে ছিলেন জে রহিম,

শেখ আবদুর রশীদ, হানিফ রামে, আবদুল হাফিজ পীরজাদা ও রফি রাজা। আওয়ামী লীগের পক্ষে আলোচনাকারী দলটি ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও আমাকে নিয়ে। দলগত বৈঠকে আওয়ামী লীগ সদস্যদের ধারণা ছিল যে ছয়দফা কর্মসূচির মর্মবস্তুর ওপর আলোকপাত করেই আলোচনা চলবে। কাজেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পিপলস পার্টির নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হল যেন তাঁরা ছয়দফার বিরুদ্ধে তাদের আপত্তিগুলো তুলে ধরেন। তাঁদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হল যে, ছয়দফার ব্যাপারে তাঁদের কোনো সন্দেহ থাকলে তা দূর করতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হবে। কিন্তু রহিমের নেতৃত্বে পিপলস পার্টির আলোচকরা সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরার পরিবর্তে 'সমাজতন্ত্রের' অর্থ নিয়ে বিমূর্ত আলোচনা শুরু করলেন। রহিম বোঝাতে শুরু করলেন যে, 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্যে শক্তিশালী কেন্দ্র (কেন্দ্রীয় সরকার) প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য শক্তিশালী কেন্দ্রের উল্লেখ করলেন। আওয়ামী লীগের আলোচকরা রহিমকে বললেন, ঐ রকম তুলনা আলোচ্য বিষয়াবলির জন্যে অপ্রাসঙ্গিক। আলোচনা সুনির্দিষ্টভাবে ছয়দফা কর্মসূচির ওপর নিবদ্ধ করার জন্যে আওয়ামী লীগ সদস্যরা রহিমকে চাপ দিলেন। ঐ বৈঠক সম্পর্কে আমার মনে পড়ে যে, ছয়দফা কর্মসূচির মাধ্যমে উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট বিষয়াবলির ওপর আলোচনা চালাতে তাঁদের (পিপলস পার্টির নেতাদের) দিক থেকে লক্ষণীয় অনীহা ছিল। তাঁরা কোনো বিকল্প শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাও তুলে ধরলেন না। কাজেই আলোচনাটি একেবারেই কোনো রূপ লাভ করল না এবং কোনো প্রকৃত মতামত বিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপিত হল না। আমি হাফিজ পীরজাদাকে ভর্ৎসনার সুরে বললাম যে একজন আইনজীবী হিসেবে আলোচনার ক্ষেত্রে আরও বিষয়নিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁর উপলব্ধি করা উচিত। তাঁকে অনুরোধ করা হল, দফাওয়ারীভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া এবং আপত্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরার জন্যে তিনি যেন তাঁর সহকর্মীদের বোঝান, যাতে জবাবগুলোও সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া যেতে পারে। পীরজাদা রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য দিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যে, রহিম একজন বৃদ্ধ মানুষ যাঁকে অসংযমী হতে দেয়াই ভালো, আর ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্যে যখন তাঁরা ঢাকায় আসবেন তখন আরও বিশদ আলোচনার প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। ভুট্টোর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি নিজে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন কিনা, এবং যদি একটি কোয়ালিশন গঠন করা যায় তা হলে তিনি এবং তাঁর দলের লোকেরা অন্য কোন কোন পদ পেতে পারেন।

জানুয়ারির আলোচনার শেষে ভুট্টো ঢাকায় এক সংবাদ-সম্মেলনে বললেন, "আমাদের প্রকৃত সমস্যা রয়েছে এবং কোনো মন্তব্য করার জন্যে আমাদের অন্তত ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ সময়ের প্রয়োজন।" তিনি আরও বললেন, "গণপরিষদে প্রবেশের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে আগেই সমঝোতায় উপনীত হওয়ার প্রয়োজন নেই,

কারণ পরিষদের অধিবেশনকালেও আলোচনা চলতে পারবে।" উল্লেখযোগ্য যে, যখন প্রশ্ন করা হল পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান থাকায় আওয়ামী লীগ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্য কি না, ভুট্টো জবাব দিলেন, "আইনগত দিক থেকে বলা যায় তাঁরা তা করতে পারেন, কিন্তু পরিষদকে এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শাসনতন্ত্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হবে, নাকি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। যেহেতু প্রশ্নটি শাসনতন্ত্র তৈরির এবং আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান অদ্ভুত ধরনের (peculiar) কাজেই যে-সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শাশনতন্ত্র গৃহীত হবে তাতে সকলের সাধারণ ইচ্ছা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

বিদায়কালে ভুট্টোর প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ইঙ্গিত দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁদের দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর আওয়ামী লীগের সঙ্গে আরও কথাবার্তার জন্যে তাঁরা ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৭১) আবার ঢাকায় আসবেন।

ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি এবং পিপলস পার্টি যে-ভাবভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হল তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সংলাপ পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে নয় বরং সংকট ঘনীভূত করতে এবং শেষ পর্যায়ে একটি সংঘাতের লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করছেন।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধারূপে পরিচয়দানকারী দুই তরুণ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোর নিয়ে গেল। ভুট্টো ও তাঁর পিপলস পার্টি এই ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখালেন ঐ দুই ছিনতাইকারীকে সিংহবিক্রমশালী বীর হিসেবে তুলে ধরে। ভুট্টো নিজে ঐ দুই তরুণকে মাল্যভূষিত করলেন এবং লাহোরের রাজপথে তাঁদের নিয়ে বিজয়উল্লাসে মত্ত মিছিল নামান হল। ঘটনাটি ভুট্টোকে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বেশ কিছুদিন বক্তৃতা করে বেড়ানোর সুযোগ এনে দিল।

এ-ব্যাপারে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া আমার পরিষ্কার মনে পড়ে। ছিনতাই-ঘটনার চেয়েও বিমানটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার ঘটনা অধিকতর সন্দেহের উদ্রেক করল। সন্দেহটি ছিল এরকম যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তর ব্যাহত করতে তৎপর মহলটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে নেমে পড়েছে। বিমানটি ধ্বংসের নিন্দা জানিয়ে শেখ মুজিব নিম্নরূপ বিবৃতি দিলেন :

এ ঘটনা প্রতিহত করতে কর্তৃপক্ষ দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারত। এটা মনে রাখা উচিত যে, জাতীয় জীবনের এই চরম সন্ধিক্ষণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি কেবল অন্তর্ঘাতকদের স্বার্থই রক্ষা করবে। আমি বিষয়টি তদন্ত করতে এবং সৃষ্ট পরিস্থিতিকে অশুভ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা থেকে স্বার্থবাদী মহলকে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ দুই তরুণ 'কমান্ডো'র প্রতি বীরত্ব আরোপ অব্যাহত রইল। ছিনতাই ও বিমানটি ধ্বংসের নিন্দা করায় পিপলস পার্টি খুবই দ্রুত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল। আওয়ামী লীগের লাহোর অফিস আক্রান্ত হল।

ছয়দফা কর্মসূচির আওতায় পররাষ্ট্র বিষয়াবলি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) বিষয় হওয়ার কথা থাকায় এরকম বলা হতে লাগল যে, ছিনতাই-ঘটনার প্রতি আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে একটি পররাষ্ট্রনীতি উদ্ভাবন করা কতটা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

ছিনতাই-ঘটনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোনো সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা উচিত নয়, এ-ধরনের সমালোচনার জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, এটা খুব কমই প্রত্যাশা করা যায়, কারণ তিনি স্বীকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে সে-ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করার জন্যে সরকার কোনো উদ্যোগই নেয়নি। এটা উল্লেখযোগ্য যে, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব আলভি ১ মার্চ ১৯৭১ ঢাকা এলেন এবং ছিনতাই-ঘটনার ব্যাপারে শেখ মুজিবকে অবহিত করতে সাক্ষাৎকার চাইলেন। তবে আলভি দেখতে পেলেন, ঘটনাবলি তার সফরের উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গেছে, কারণ ২ মার্চ ছিল 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর সূচনার দিন।

ভারতীয় বিমান ছিনতাইকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি হল এই যে, ভারত তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সকল পাকিস্তানি বিমান-চলাচল বন্ধ করে দিল। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিমান আসার একমাত্র পথ দাঁড়াল ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তের বাইরে দিয়ে ঘুরে, শ্রীলংকা হয়ে—যা দূরত্ব ও ভ্রমণ-সময় প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে দিল। এ ছাড়া, জান্তা পূর্বাঞ্চলে কোনো সামরিক সমাধানের প্রয়াস নিলে তাও বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ও কঠিন হয়ে পড়ল।

ভুট্টোর সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনা এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্বের ফলে শঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল যে, ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তা জাতীয় পরিষদ বসতে না দেয়ার জন্যে ছুতো খুঁজছে।

ভারতের ওপর দিয়ে বিমান-চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সৈন্য-চলাচল ও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সৈন্যদের জন্যে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল, যা তাদের সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করল।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে সক্রিয়ভাবে আলোচনা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্ব আওয়ামী লীগকে তার নিজস্ব বিকল্পগুলো বিবেচনায় অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রণোদিত করে। একটি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রস্তুত করে রাখার সিদ্ধান্ত হল। ঐ ঘোষণা দেয়া হলে তার বিরুদ্ধে সামরিক আঘাত কতটা জোরালোভাবে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ঐ আক্রমণ মোকাবিলা করে বিজয়ী হওয়ার জন্যে জনগণের শক্তি কতটুকু—সবকিছুই সতর্কভাবে বিবেচনার প্রয়োজন ছিল। বিদ্যমান সামরিক শক্তি সম্পর্কে কিছুটা হিসেব করে দেখা হল। ভারতের ওপর দিয়ে বিমান-চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এর ফলে সৈন্য ও রসদ সরবরাহে সৃষ্ট অসুবিধার বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া হল।

আমাকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরি করতে বলা হল। এই খসড়া তৈরিতে নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হল মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ভাষ্য, যেখানে ঐ ঘোষণাকে যুক্তিসঙ্গত করতে ব্রিটিশ-শাসনের অন্যায়-অবিচারকে তুলে ধরা হয়েছে। খসড়াটি প্রস্তুত হলে ১০ ফেব্রুয়ারি আমি সেটি শেখ মুজিবের হাতে তুলে দিলাম এবং তিনি সেটি নিজের কাছে রাখলেন। তাজউদ্দিন আহমদ ঐ খসড়াটি প্রণয়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। যদি স্বাধীনতা-ঘোষণার কর্মপন্থা গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের দায়িত্বও ছিল তাজউদ্দিন আহমদেরই। ঐ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ছিল : রাজপথে লাখ লাখ মানুষ নামিয়ে দিয়ে প্রধান-প্রধান শহরগুলোতে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু ; এভাবে, সামরিক বাহিনীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফেলে বেতারকেন্দ্র, সচিবালয় ও গভর্নর'স হাউস দখল এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা-হস্তান্তর করে গভর্নরের কাছ থেকে ঘোষণা আদায় ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে, আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্যে চাপ অব্যাহত রাখে। 'ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্যে' ১৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সকল আওয়ামী লীগ সদস্য ও দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এক যৌথসভা আহ্বান করা হয়। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হতে থাকে যে, স্বাধীনতা-ঘোষণার সিদ্ধান্ত বিবেচনার উদ্দেশ্যেই ১৩ ফেব্রুয়ারির ঐ সভা আহ্বান করা হয়েছে। আমার মনে পড়ে, সভার প্রাক্কালে এক বিদেশি কূটনীতিক শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এই বৈঠকে কি আপনারা একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা (Unilateral Declaration of Independence) দিতে যাচ্ছেন?"

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান বিলম্বের কারণে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণম্মুখ হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায়, আওয়ামী লীগের ঐ যৌথসভা অনুষ্ঠানের দিন সকালে ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।

ইয়াহিয়ার ঘোষণায় ভুট্টোর প্রতিক্রিয়া ছিল সংকটের দিকে আরেক পা এগিয়ে যাওয়া। ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে এক বিবৃতিতে ভুট্টো ছয়দফা প্রশ্নে 'আপোস বা সমঝোতা'র লক্ষ্যে কোনো মতৈক্যের অনুপস্থিতিতে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদানে তাঁর দলের অসামর্থ্য প্রকাশ করলেন। ভুট্টো আরও বললেন যে, ঢাকায় গেলে তাঁর দলের সদস্যরা বিপদে পড়বেন এবং ভারতীয় বৈরিতা ও ছয়দফা মেনে না নেয়ার কারণে 'দুই দফা জিম্মি হওয়ার অবস্থানে' তিনি নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন না। ১৬ ফেব্রুয়ারি করাচিতে ভুট্টো বললেন, আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে তাঁর দলের যোগদান না করার সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি করাচিতে ভুট্টো বললেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধবেশনে পিপলস পার্টির অংশগ্রহণ অর্থহীন।' ভুট্টো বললেন, তাঁর দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতামূলক বন্দোবস্ত ও মতৈক্যে পৌঁছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন 'আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর আলোচনার

কোনো অবকাশ নেই।' আওয়ামী লীগের ছয়দফা প্রসঙ্গে ভুট্টো বললেন, 'সবচেয়ে মুশকিল হল বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত দফাটি নিয়ে।'

ভুট্টোর এসব কথাবার্তায় পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হল যে তিনি অবস্থান কঠোর করেছেন এবং তা জানুয়ারির শেষ নাগাদ ঢাকায় দেয়া তাঁর বিবৃতির পরিপন্থী। জানুয়ারিতে ভুট্টো বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আরও আলোচনা চালানো হবে এবং এ-ধরনের আলোচনা এমনকি জাতীয় পরিষদের ভেতরেও চলতে পারে। পক্ষান্তরে ভুট্টো এখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতেই অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন এবং জেদ ধরে বসেছেন যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর কোনো আলোচনার অবকাশ নেই।

সামরিক জান্তা অথবা জান্তার অন্তত একটি অংশের অবস্থান কঠোরতর হয়ে উঠছে এবং সম্ভবত ভুট্টো তাদের সঙ্গেই যুক্ত—বাঙালিদের এই সন্দেহ প্রতিফলিত হল ভুট্টোর কাছে তুলে ধরা এক সাংবাদিকের প্রশ্নে, যার জবাবে ভুট্টো অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন যে, পরিষদে তাঁর দলের যোগদান না করার সিদ্ধান্তের পেছনে বর্তমান ক্ষমতাসীন মহলের কোনো আশীর্বাদ নেই। তিনি বললেন, তাঁর এবং অন্য কারও মধ্যে 'পর্দার আড়ালে' সমঝোতার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাঙালির সন্দেহ এবং সাংবাদিকের উত্থাপিত প্রশ্ন যে জোরালো ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইয়াহিয়ার এক উপদেষ্টার পরবর্তীকালে দেয়া এক বিবরণীতে সে কথাই প্রতীয়মান হয়। মধ্য-ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

ভুট্টো ইতিমধ্যেই নিজের দরকষাকষির ক্ষমতা জেনে গিয়েছিলেন। সামরিক জান্তার ক্ষমতাবান সদস্যরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে থাকার পরিবর্তে বরং ছিলেন ভুট্টোর সঙ্গে। ইয়াহিয়া তাঁর নিজের ইচ্ছায় ক্ষমতা-হস্তান্তর ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু জান্তা 'অপেক্ষা করো ও দেখ' নীতি অবলম্বন করল। যে-কোনো রকমের শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইয়াহিয়া যদি দেশের ঐক্যরক্ষায় সক্ষম হতেন তো ভালোই হত ; কিন্তু জানুয়ারির শেষ নাগাদ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার ব্যর্থ বৈঠকের পর থেকে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলোতে জান্তা আর নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে রাজি ছিল না। জানুয়ারি থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বদলে গেল। ... আহসানের মতো, এটা আমার ধারণা যে, ফেব্রুয়ারিতে হামিদ ইয়াহিয়াকেও সরিয়ে দিতে পারতেন ; আর সরে যেতে ইয়াহিয়া হয়তো অখুশি হতেন না, তবে কিছু-কিছু কারণে জান্তাকে ইয়াহিয়ার সঙ্গেই চালিয়ে যেতে হল, আর ইয়াহিয়াও এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে নিজের ভূমিকা অব্যাহত রাখলেন।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠল। ১৯ ফেব্রুয়ারি নাগাদ ঢাকায় সামরিক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হল। দেখা গেল, ঢাকায় জাতীয় পরিষদ ভবনের সামনের টিবিতে ছাউনি পেতে মেশিনগান বসানো হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শেখ মুজিব দ্রুত দলীয় নেতাদের বৈঠক ডাকলেন। ছাত্র-নেতাদের কয়েকজনও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমিও বৈঠকে ছিলাম। বৈঠকে জানানো হল যে ক্যান্টনমেন্টে ব্যাপত তৎপরতা লক্ষ করা গেছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোনো

ধরনের সামরিক পদক্ষেপ শুরু হতে যাচ্ছে। এ হেন পরিস্থিতির মুখে অনুভূত হল যে ঐ রাতে নিজ বাড়িতে থাকাটা নেতাদের কারও জন্যে ঠিক হবে না ; কোনো সামরিক অভিযান শুরু হলে সকলকেই গ্রামে চলে যেতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। যা হোক, তখন কোনো সামরিক অভিযান শুরু হল না, তবে উত্তেজনা বাড়তে লাগল।

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে পরিস্থিতি ছিল চাপা উত্তেজনায় ঠাসা এবং আবেগ-আপ্লুত। আবারও প্রত্যাশা দেখা দিল যে শহীদ মিনারের সমাবেশে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন। যা হোক, ঐ সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, বাঙলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দাবি মেনে না নিলে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হলেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করে ছাড়বে।

ইতিমধ্যে, অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি দলগুলোর প্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে আওয়ামী লীগ এই অবস্থান গ্রহণ করল যে ছয়দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও খসড়ার সকল দিক নিয়ে তারা অবশ্যই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ছয়দফা কর্মসূচির আওতায় ফেডারেল সরকারের অস্তিত্ব এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের বৈধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা নিরসনের চেষ্টা করবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব সংবাদ-মাধ্যমে এক বিশদ বিবৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করলেন। সম্ভবত একই সময়ে সামরিক জান্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠক সম্পর্কে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা এ রকম বিবরণ দেন :

লারকানায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার উদ্দেশ্যে সামরিক জান্তা মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে রাওয়ালপিন্ডিতে মিলিত হল। ঐ বৈঠকে জান্তা সিদ্ধান্ত নেয় যে শেখ মুজিব আপোসহীন মনোভাব অক্ষুণ্ন রাখলে তারা তা মোকাবিলা করবে ; তবে ভুট্টোর উসকানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির ব্যাপারে আলোচনা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হল। পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের মতোই হামিদ, ওমর, গুল হাসান ও ভুট্টোর বিশ্বস্ত বন্ধু পীরজাদার মতো ধুরন্ধর জেনারেলরাও ভুট্টোকেই পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বার্থের' রক্ষকরূপে গণ্য করেছিলেন। বৈঠকে জান্তা মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ারও সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচনের পর অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবে ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০ মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ইয়াহিয়া মন্ত্রিসভা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারণ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে এবং অন্য কয়েকজন শাসনতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকা পর্যন্ত ইয়াহিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় ছিলেন। জান্তার ওপর ইয়াহিয়ার প্রভাব কখনোই নিরঙ্কুশ ছিল না—শেখ মুজিবের নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থতার কারণে এখন তা আরও কমতে শুরু করেছিল। আহসান (পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর) ও ইয়াহিয়া দুজনই জান্তার নিন্দার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। আহসান অব্যাহতি চাইছিলেন। জান্তা সিদ্ধান্ত নিল আহসানকে সরিয়ে এক যুদ্ধোন্মাদ

লে. জেনারেল টিক্কা খানকে ঐ পদে নিয়োগ করতে। ফেব্রুয়ারির ১৭ তারিখে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হল ; কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই আমাকেসহ ঐ ভেঙে দেয়া মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে ইয়াহিয়া তার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। একটি মন্ত্রি-পরিষদের পরিবর্তে ইয়াহিয়া একটি উপদেষ্টা-পরিষদ চাইছিলেন। (তবে একমাত্র আহসানুল হক ছাড়া ঐ প্রস্তাবিত পরিষদের বাঙালি সদস্যরা কাজ চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। অন্যদিকে, সাবেক মন্ত্রিসভার পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের মধ্যে কেবল কর্নেলিয়াস উপদেষ্টা হিসেবে থাকতে রাজি হলেন)।

আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছিল এবং ১ মার্চের আগেই শাসনতন্ত্র বিল তৈরির কাজ চূড়ান্ত করতে দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইয়াহিয়া ১ মার্চ ঢাকা পৌঁছবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল এবং শেখ মুজিব আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে খসড়া শাসনতন্ত্রের একটি আগাম অনুলিপি ইয়াহিয়াকে দিতে হবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি যখন ঐ দায়িত্ব পালনে কাজ করছিল তখন একজন উর্ধ্বতন বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা খবর নিয়ে এলেন যে, ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, শেখ মুজিবের উচিত অবিলম্বে গভর্নর আহসানের সঙ্গে দেখা করে এ-ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানো। বিষয়টি শেখ মুজিবকে জানানো হলে তিনি সেদিনই সকালে আহসানের সঙ্গে দেখা করলেন। তথ্যটি আহসানকেও বিব্রত করল বলে মনে হল। শেখ মুজিব আহসানকে বললেন যে, এ-ধরনের স্থগিতকরণকে বাঙালি জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য করবে এবং পরিস্থিতি বিস্ফোরিত হবে। আহসান এ-বক্তব্য ইসলামাবাদকে অবহিত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আহসান পরে জানালেন যে, তিনি ইসলামাবাদকে ঐ বক্তব্য জানিয়েছেন, তিনি নিজে থেকেই এ-পরামর্শও দিয়েছেন যে যদি পরিষদের বৈঠক স্থগিত করতেই হয় তা হলেও তা যেন অনির্দিষ্টকালের জন্যে না হয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দিনকতকের জন্যে হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি এক ভাষণে শেখ মুজিব বললেন, পরিষদের কোনো সদস্য যদি যুক্তিসঙ্গত কিছু বলেন তবে তা মেনে নেয়া উচিত। ঐদিনই ভুট্টো এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বললেন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণের বিষয়টি (ছয়দফার ভিত্তিতে) তিনি মেনে নিতে পারেন না। ভুট্টো এই বলে শেষ করলেন যে, হয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করতে হবে, নয়তো শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ১২০ দিনের সময়সীমা তুলে নিতে হবে।

পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণের তাৎক্ষণিক পটভূমি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টার দেয়া বিবরণে প্রতীয়মান হয়, ভুট্টো ইতিমধ্যেই সামরিক জান্তার সঙ্গে সহযোগিতামূলক পন্থায় একযোগে কাজ করছিলেন। বিবরণীতে বলা হয় :

এক বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে ইয়াহিয়া তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিরেন। ভুট্টোর হুমকির পর ৩ মার্চের নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত

ঘোষণা করা হল। কোনো ঘোষণাই সম্ভবত ১ মার্চে প্রচারিত ইয়াহিয়ার ঐ ঘোষণার চেয়ে বেশি উসকানিমূলক অথবা বিয়োগান্তক হতে পারত না। ৫ মার্চ আমি যখন তাঁকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম, ইয়াহিয়া শূন্য এবং অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে ইয়াহিয়া ঐ ঘোষণায় স্বাক্ষরদাতা মাত্র। জানা গেল, ভুট্টো ও পীরজাদা মিলে বিবৃতিটি তৈরি করেছিলেন। আর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, ইয়াহিয়া কোনো বেতার ভাষণ দেননি—বেতারে কেবল বিবৃতিটি পড়ে শোনানো হয়।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যাতে স্থগিত করতে না হয় সেজন্যে ভুট্টোকে ঢাকা যেতে রাজি করাতে ইয়াহিয়া নিজে করাচির উদ্দেশে রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগের আগে একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অধিবেশনে যোগ দিতে ভুট্টোকে রাজি করাতে পীরজাদা, আহসান ও ইয়াকুবকে করাচি পাঠিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ভুট্টোকে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুজিব যদি 'ছয়দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র চাপিয়েই দেন' এবং যদি তাঁর শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের অর্থ দাঁড়ায় দেশের বিভক্তি, তা হলে তিনি (ইয়াহিয়া) তৎক্ষণাৎ পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করে দেবেন। কিন্তু কোনোকিছুই ভুট্টোকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে পরিষদ বর্জনে ভুট্টোর হুমকির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ পরিষদ-সদস্যই অধিবেশনে যোগদান করবেন না, তখন ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি বিবৃতি দিতে, যা পূর্ব পাকিস্তানে যতটা সম্ভব কম উত্তেজনার কারণ হবে। যদিও আমি আর তখন ইয়াহিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলাম না, তথাপি তিনি আমাতে সমঝোতামূলক ভঙ্গিতে একটি বিবৃতি তৈরি করতে বলেছিলেন। আমি অবিলম্বে বিবৃতিটির মুসাবিদা শুরু করলাম, যা ছিল নিম্নরূপ :

"পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান দুটি দলের মধ্যে পুরোপুরি অচলবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাধ্য হয়ে ৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখে আহূত জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করলাম। তবে আমি এটা পরিষ্কার করে জানাতে চাই যে, এই স্থগিতাবস্থা দুই অথবা তিন সপ্তাহ অতিক্রম করবে না এবং এই স্বল্প-সময়ে দেশের দুই অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব। আপনারা স্মরণ করতে পারেন, অতীতে আমি বহুবার বলেছি এবং আবারও সুনিশ্চিত করতে চাই যে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব অথবা পশ্চিম পাকিস্তান কোনোটির ওপরই শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। দেশের বিভিন্ন অঙ্গ-এলাকা (federating units)-গুলোর সাধারণ ইচ্ছার বাইরে একটি সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) শাসনতন্ত্র, যার প্রতি রাজনৈকিক দলগুলো এবং আমার সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ, তৈরি করা সম্ভব নয়। একটি ফেডারেল ইউনিয়নের ব্যাপারে সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হলে আমিই হব সবচেয়ে সুখী মানুষ এবং আমার পক্ষ থেকে জাতিকে আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনে আমি কোনো চেষ্টাই বাদ রাখব না।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি এবং আমার পূর্ব পাকিস্তানের ভাইদের প্রতি আবেদন জানাই, যাতে তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং দুই অথবা তিন সপ্তার এই স্বল্প সময়ে একটি সম্মত ফরমুলায় উপনীত হওয়ার জন্যে আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন। ইনশাআল্লাহ্ এই সংকট কাটিয়ে উঠতে আমরা সক্ষম হব। আসুন আমরা কায়েদ–ই–আজমের সেই অমর উক্তি স্মরণ করি যে, 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে।' আসুন, আমরা সবাই জাতির জনকের প্রত্যাশা পূরণে আত্মনিবেদন করি।"

ইয়াহিয়ার করাচি যাওয়ার প্রক্কালে ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে আমি বিবৃতির খসড়াটি তাঁর হাতে দিলাম। ইয়াহিয়া পরে সেটি দিয়েছিলেন পরীজাদাকে, যিনি ভুট্টোর সঙ্গে জোট বেঁধে বিবৃতিটি বানচাল করেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে করাচি না যাওয়ার জন্যে আমি এখনও দুঃখ অনুভব করি। এক্ষেত্রে আমার অনীহার কারণ ছিল এই যে, আমি তখন আর ইয়াহিয়ার মন্ত্রী ছিলাম না এবং 'উপদেষ্টা' হওয়ার জন্যে ইয়াহিয়ার প্রস্তাব গ্রহণেও আমি অসামর্থ্য প্রকাশ করেছিলাম। ইয়াহিয়ার সঙ্গে করাচি গেল তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা উঠত। তবে এখন আমি উপলব্ধি করি যে, ইয়াহিয়ার প্রধান দুর্বলতা ছিল তার অস্থিরচিত্ততা। আমার খসড়াটি ইয়াহিয়া অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে ভুট্টো ও পীরজাদা যখন আরেকটি খসড়া উপস্থিত করেন, তখন ইয়াহিয়া তাঁর দুর্বল ব্যক্তিত্বের কারণে উসকানিমূলক বিবৃতিটিই গ্রহণ করলেন। যদিও বিষয়টি প্রমাণের জন্যে আমার হাতে কোনো দলিলপত্র নেই, তবে প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত কর্মচারীদের কাছে আমি শুনেছি, 'ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' পীরজাদা যে–বিবৃতিটি তৈরি করেছিলেন, সেটি সই করতে ইয়াহিয়া খুবই অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু চাপ ছিল জোরালো এবং ইয়াহিয়া নতিস্বীকার করলেন।

গভর্নর আহসানের মাধ্যমে ইয়াহিয়াকে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানানো হয়েছিল যে, পরিষদ স্থগিতকরণ পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিস্ফোরণের সূচনা করবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্তও লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল পরদিন (১ মার্চ) ইয়াহিয়া ঢাকায় পৌঁছতে পারেন। প্রেসিডেন্টের ঢাকা আসার আগে সচরাচর যে–প্রস্তুতি নেয়া হয়, তা নেয়া হচ্ছিল। যা হোক, ১ মার্চ করাচি থেকে যে–বিমান এসে পৌঁছল, তাতে ইয়াহিয়া এলেন না। ঐ বিমানে করে এসেছিলেন এরকম একজন সরকারি কর্মকর্তা জানালেন, করাচি থেকে বিমানটির উড্ডয়ন দুই দফা বিলম্বিত করা হয় এবং ধারণা করা হচ্ছিল যে ইয়াহিয়া ঐ ফ্লাইটটি ধরবেন। শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া না আসারই সিদ্ধান্ত নেন। জানা গেল যে, ঐ রাতে ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার ব্যাপক আলোচনা হয়েছে।

খসড়া শাসনতন্ত্র বিলে চূড়ান্ত আঁচড় বোলাতে আওয়ামী লীগের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি দলীয় কার্যালয়ে পূর্ণ–বৈঠকে বসেছিল। কমিটি তখন পর্যন্ত পয়লা মার্চকেই চূড়ান্ত সময়সীমা গণ্য করে কাজ করে যাচ্ছিল এবং কাজও প্রায় শেষ করে এনেছিল ; এমন সময় একজন দলীয় কর্মী এসে কমিটিকে জানালেন যে, বেলা ১টায় বেতারে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচারিত হবে। কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং শেখ মুজিব ও দলের

অন্যান্য নেতা এসে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ঘোষণাটি শোনার জন্যে একটি রেডিও সেট নিয়ে আসা হল।

বেলা ১টা ৫ মিনিটে বেতার–ঘোষক ইয়াহিয়ার বিবৃতি বলে উল্লেখ করে একটি ভাষ্য পড়লেন। বিবৃতির কার্যকর বিষয়টি ছিল এই যে, 'জাতীয় পরিষদের বৈঠকে পরবর্তী কোনো তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করার' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ স্থগিতকরণ ছিল অনির্দিষ্টকালের জন্যে। বিবৃতিতে এর কারণ হিসেবে বলা হল যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো সর্বগ্রাহ্য সাধারণ মত (Accepted consensus) গড়ে ওঠেনি। ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের রাজনৈতিক সংঘাতের উল্লেখ করে বললেন যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের এত বেশিসংখ্যক প্রতিনিধি পরিষদে যোগ না দেয়া সত্ত্বেও তিনি যদি ৩ মার্চ পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন তা হলে খোদ পরিষদই বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়তে পারে।' বিবৃতিতে আরও বলা হল যে, 'শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে একটি যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্যে রাজনৈতিক নেতাদেরকে আরও বেশি সময় দেয়া একান্ত প্রয়োজন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া মাত্র পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে।'

অন্য কথায়, ইয়াহিয়া এটা পরিস্কার করেই জানিয়ে দিলেন যে, শাসনতন্ত্র তৈরিতে ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভেটো ক্ষমতা থাকবে এবং বস্তুত তাদের সঙ্গে একটি আগাম সমঝোতা ছাড়া পরিষদের বৈঠক ডাকা হবে না। বাঙালিরা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এভাবে তাদেরকে অক্ষম করে দেয়া হল।

বেতার–ঘোষণাটি যাঁরা শুনছিলেন তাদের প্রতিক্রিয়া হল নিদারুণভাবে অপমানিতের। সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটিতে যা বলা হল তার চেয়ে বড় প্রকাশ্য অবমাননা বাঙালি জনগণের জন্যে আর কিছু হতে পারত না। বস্তুত কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রমাণিত হল যে, দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত সকলের মতোই এক অনভূতি ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক জনগণের মধ্যে। সরকারি কর্মচারীরা সেক্রেটারিয়েট এবং অন্যান্য সরকারি অফিস থেকে বের হয়ে পড়লেন ; ব্যাংক, বীমাসহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলোও খালি হয়ে গেল। স্টেডিয়ামে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। ইয়াহিয়ার বেতার–ঘোষণা শোনামাত্র দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে দলে–দলে বেরিয়ে আসতে লাগল। ছাত্ররা ইতিমধ্যেই রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু করেছিল।

ইয়াহিয়ার ঘোষণা শোনার পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ দলীয় সকল পরিষদ সদস্যকে বেলা তিনটায় হোটেল পূর্বাণীতে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বলা হল, সেখানে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ওপর পরিষদ–সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

সন্দেহ ছিল না যে, আমাদের ইতিহাসের এক নির্ধারক মুহূর্ত সমুপস্থিত। এটাও পরিষ্কার ছিল যে, ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির কাছে নতিস্বীকারে রাজি নয় এবং তারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। তাদের ছিল বিমানবাহিনীর মদদপুষ্ট এবং ট্যাংকসহ সকল সমরাস্ত্রসজ্জিত একটি সেনাবাহিনী। আর এর বিপরীতে বাঙালির

পক্ষে ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি বিক্ষুব্ধ মানুষ, যাদের ছিল কেবল বঞ্চিত ও নির্যাতিত হওয়ার এক অভিন্ন অনুভূতি আর মাথা না–নোয়াবার দৃঢ় সংকল্প। উপরন্তু তারা নিরস্ত্র এবং এটা পরিষ্কারভাবে জানা ছিল যে, কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন দিয়ে তার মূল্য শোধ করতে হবে।

এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, বাঙালির সামনে একটাই পথ, প্রতিবাদের পথ। কাজেই সংঘর্ষ অত্যাসন্ন ছিল। এটা জানা ছিল না যে, ঐদিনই সামরিক আঘাত শুরু হচ্ছে না। আমি যখন পূর্বাণী হোটেলে পৌঁছলাম তখন শহরের বিভিন্ন দিক থেকে জঙ্গি জনতার মিছিল পূর্বাণী হোটেল অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। মিছিলগুলোর জঙ্গি চরিত্র ছিল খুবই পরিষ্কার। প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে ছিল একটি করে বাঁশ অথবা লাঠি আর তাদের কণ্ঠে ছিল 'স্বাধীনতা'র স্লোগান।

যা ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের প্রতিক্রিয়ায় অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সাফল্যের মধ্য দিয়ে জনমনে যে–বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছিল, প্রথমে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা ও পরে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন চাপিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে সে–আশা ভূমিসাৎ হয়েছিল। এরপর আরেক দফা বিপুল প্রত্যাশা এবং সত্তরের ঘূর্ণিঝড়–পরবর্তী পরিস্থিতির প্রতি সহানুভূতিহীন আচরণের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তিক্ত অনুভূতি নিয়ে বাঙালি নির্বাচনে যায় এবং তাদের রায় দেয়। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে আলাপ–আলোচনার নামে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সামরিক সরকারের অথবা এর ক্ষমতা–ভিত পাঞ্জাবের (পাঞ্জাবি নেতাদের) সদিচ্ছার ওপর বাঙালি জনগণের বিন্দুমাত্র বিশ্বাসও অবশিষ্ট ছিল না। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়ার ঘোষণায় শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও পাকিস্তানের সংহতি উভয় ক্ষেত্রেই তাদের বিশ্বাস ভেঙে যায়। উনসত্তরের অভিজ্ঞতা বাঙালিকে যে–আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল তাতে ইতিহাসের গতিধারা রূপায়ণে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে বাঙালি এখন সংকল্পবদ্ধ হল। অতএব বাঙালির সামনে এখন লক্ষ্য স্থির হল স্বাধীনতা এবং ঐ লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিতে তারা রাজনীতিকদের প্রতি দাবি জানাল।

আওয়ামী লীগের গণপ্রতিনিধিরা বেলা তিনটার মধ্যেই পূর্বাণীতে সমবেত হলেন। দলীয় নেতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত শেখ মুজিব এলেন ৩টা ২০ মিনিটে। পরিস্থিতি ছিল তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ। বাইরে জড়ো হয়েছিলেন শত শত বিদেশি সাংবাদিক। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন ... "কেবল সংখ্যালঘু দলের ভিন্নমতের কারণে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়া হয়েছে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করা হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ... আমরা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি এবং আমরা এটা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিতে পারি না।"

শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। পরবর্তী ছয় দিনের জন্যে আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হল। এতে ছিল : পরদিন ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল, ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ ঢাকায় জনসভা।

এভাবে জাতীয় পরিষদ স্থগিতকরণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিবাদটি জানানো হল অসহযোগ আন্দোলনের আকারে। এর অপরিহার্য অর্থ ছিল যে, কোনো বাঙালি কোনোভাবেই ইয়াহিয়া অথবা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করবে না। ২ মার্চ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, "গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগিতা না করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে-কোনো ষড়যন্ত্র সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা সরকারি কর্মচারীসহ প্রতিটি পেশার প্রত্যেক বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব।" ঘোষণায় বলা হল, "জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস। আশা করা হচ্ছে, সকল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে।"

আসন্ন দিনগুলোতে করণীয় ছিল অসহযোগ আন্দোলনকে এমনভাবে পরিচালনা করা, যাতে তা প্রশাসনকে স্থবির করে দেয়ার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় এবং একই সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে জরুরি সার্ভিস এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না করারও নিশ্চয়তা দেয়।

সিদ্ধান্ত হল, সকল নির্দেশ কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জারি করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নির্দেশাবলি প্রণয়ন এবং শেখ মুজিব ও দলীয় নেতৃবৃন্দের অনুমোদনের পর তা প্রচারের জন্যে তাজউদ্দিন আহমদ, আমীর-উল-ইসলাম ও আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল।

২ মার্চ প্রচারিত প্রথম নির্দেশপত্রে ৩ থেকে ৬ মার্চ ১৯৭১ প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হল। সরকারি দফতরসমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালত, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত করপোরেশনসমূহ : যেমন—ডাকবিভাগ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি ও বেসরকারি পরিবহণ, কল-কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দোকানপাট সবকিছুই হরতালের আওতাভুক্ত হল। কেবল অ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান এবং বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে হরতালের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। অফিস-আদালত, কল-কারখানাসহ সবকিছুই স্থবির হয়ে পড়ল।

প্রতি সন্ধ্যায় সামরিক বাহিনী কারফিউ জারি করল, যা নিয়মিতই অমান্য করা হল। বেশকিছু স্থানে কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করল এবং এতে অনেক মানুষ হতাহত হল। জানা গেল, সামরিক কমান্ডার জেনারেল ইয়াকুব তাঁর সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে চাপ দিচ্ছেন, কারণ গণআন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করায় তা দমন করতে নিজের অধীনস্থ সেনাবলকে তিনি অপ্রতুল মনে করছিলেন। ধারণা করা হয়, এই সামরিক বিবেচনা থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে মুখোমুখি মোকাবিলা না করে সরবরাহবৃদ্ধির অর্থাৎ বর্ধিত সেনাদল এসে পৌঁছার অপেক্ষা করতে থাকেন। যে-কারণেই হোক, মার্চের প্রথম সপ্তাতেই ইয়াকুবকে সরিয়ে তাঁর স্থলে বেলুচিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নির্মম অভিযান পরিচালনার জন্যে কুখ্যাতি অর্জনকারী জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ করা হল।

৩ মার্চ ছাত্রদের আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব দাবি করলেন যে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা

হস্তান্তর করতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন, যদি জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে বলপ্রয়োগে দমন করা হয়, তা হলে দাবি আদায় করতে জনগণ জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। ঐ জনসভায় শেখ মুজিব 'খাজনা বন্ধ' ('no tax') আন্দোলনের ডাক দিলেন।

ঐদিনই সন্ধ্যায় ইসলামাবাদ থেকে এক বেতার-ঘোষণায় ১০ মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়া কর্তৃক আহূত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল ধরনের এক বৈঠকের প্রস্তাব করা হল। সামরিক জান্তা চলমান আন্দোলনের তীব্রতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান ঐ তীব্রতাকে কেবল আরও কিছুটা উসকে দিল, কারণ এর অর্থ ছিল জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটিকে অন্য এমন নেতাদের সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকে বসতে বলা যেসব নেতার আদৌ সেখানে উপস্থিতির দাবি ও যোগ্যতা দারুণভাবে প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দেখা দেবে। ইতিমধ্যে কারফিউ ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ অব্যাহতভাবেই চলছিল।

আন্দোলন চাইছিল শেখ মুজিব যেন ঐ বেতার-ঘোষণাটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে দুএকজন পরামর্শ দিলেন যে, প্রস্তাবটি তক্ষুনি নাকচ না করে, কোনো জবাব দেয়ার আগে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যেতে পারে। অন্যেরা কেউ-কেউ বললেন, প্রতিক্রিয়া জানানোর বিষয়টি অন্তত পরদিন সকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু শেখ মুজিব, বিদ্যমান মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়ে, ইয়াহিয়ার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তৎক্ষণাৎ এক ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেভাবে, অবিলম্বে প্রচারের জন্যে আমাকে একটি বিবৃতি তৈরি করতে বলা হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইয়াহিয়া কর্তৃক ঐ বৈঠক আহ্বানকে এক 'নিষ্ঠুর প্রহসন' আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা দেয়া হল। ফলে, দেশের ভেতরে ও বাইরে সকল মহলের মনোযোগ এখন নিবদ্ধ হল ৭ মার্চ আহূত জনসভার ওপর। বিদেশি ভাষ্যকাররা ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করলেন যে, ৭ মার্চ একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা (UDI) দেয়া হবে।

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল গতিতে সামনে এগিয়ে চলছিল। অব্যাহত হরতালের নির্দেশ সর্বাত্মকভাবে পালিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিগ্গিরই অনুভূত হল যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের স্বার্থেই জরুরি সার্ভিসসমূহ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন, যাতে সাধারণ মানুষ পরিহারযোগ্য কষ্টভোগ থেকে রক্ষা পায়। অসহযোগ আন্দোলন পয়লা মার্চ শুরু হওয়ায় সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীরা অনেকেই তাঁদের বেতন তুলতে পারেননি। যারা চেক-এর মাধ্যমে বেতন পেয়েছিলেন তাদের অনেকেই টাকা তুলতে পারেননি। যে-সব সমস্যা সামনে এসে পড়ছিল সে-গুলোকে চিহ্নিত করে এবং দক্ষতার সঙ্গে সে-সবের সমাধানের পরামর্শ যুগিয়ে সর্বস্তরের সকল পেশার মানুষ অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

ঐসব সমস্যা মোকাবিলায় ৪ মার্চ আরও কিছু নির্দেশ জারি করা হল। এসব নির্দেশ এখন দেয়া হল ইতিবাচক পরামর্শের আকারে, অর্থাৎ জনগণকে কেবল সুনির্দিষ্ট

কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে নয়, বরং আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত নীতিমালার আওতায় তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বা সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে বলে। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক বাস্তবতার দিক থেকে অস্তিত্বশীল (defacto) একটি সরকারের দায়দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ। সুতরাং ৪ মার্চ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ জারি করা হল যে, যে-সব সরকারি অফিসে কর্মচারীরা তাঁদের বেতন পাননি সে-সব অফিসে কেবল বেতন দেয়ার জন্যে বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত কাজ চলবে। একই সঙ্গে এই নির্দেশও দেয়া হল যে, কেবল অনূর্ধ্ব দেড় হাজার টাকার বেতনের চেক ভাঙানোর প্রয়োজনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লেনদেনের কাজে ব্যাংকগুলো বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

যেহেতু আশঙ্কা ছিল যে, ব্যাংক খুলে দিলে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার শুরু হতে পারে, কাজেই সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হল যে বাংলাদেশের বাইরে কোনো অর্থ প্রেরণ চলবে না এবং স্টেট ব্যাংককেও সে-অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। সকালের পরিবর্তে বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত সময় নির্ধারণও সুপরিকল্পিতভাবেই করা হয়েছিল যাতে সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার থাকে যে কাজকর্ম স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলছে না, বরং সুনির্দিষ্টভাবে আওয়ামী লীগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলির অধীনে এবং ঐসব নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু চলছে। হরতালের আওতা থেকে চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের গাড়ি, দমকলবাহিনী এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় ও ট্রাঙ্ক-টেলিফোন সার্ভিসকে অব্যাহতি দেয়া হল। এসব নির্দেশ খুবই কঠোরভাবে পালিত হল এবং অফিস ও ব্যাংকগুলো তাদের ওপর জারি-করা নির্দেশ পালনের জন্যে বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত কাজ করতে লাগল।

খাদ্য-সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার প্রয়োজনে খাদ্য-গুদামগুলোকে বিকেল সাড়ে চারটার পর কাজ চালানোর অনুমতি দিয়ে আরেক নির্দেশ জারি করা হল।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কেউ-কেউ জানালেন, যে-সব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নগদে বেতন দেয়া হয় তাদের সে-সব প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিকের বেতনের টাকা একসঙ্গে ব্যাংক থেকে তুলতে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দেড় হাজার টাকার চেয়ে অনেক বড় অঙ্কের চেকও ভাঙানোর প্রয়োজন রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে চাহিদা মেটাতে ব্যাংকগুলোর ওপর জারি-করা নির্দেশ পরিমার্জিত করে বলা হল যে, শ্রমিকদের বেতন দেয়ার উদ্দেশ্যে দেড় হাজার টাকার চেয়ে বড় অঙ্কের কোনো চেকের সঙ্গে ঐ অঙ্কের যোগফল দেখিয়ে শ্রমিকদের বেতন রেজিস্টার সরবরাহ করা হলে ঐ চেক ভাঙানো যাবে। কার্যত এই ব্যবস্থাও প্রশাসনিক দিক থেকে অসুবিধাজনক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হল যে, সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক প্রমাণীকৃত হলে দেড় হাজার টাকার চেড়ে বড় অঙ্কের চেক ভাঙানো যাবে।

মার্চের ৬ তারিখে সানাউল হকের নেতৃত্বে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের (civil servants) একটি দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন যে, তাঁরা শেখ মুজিবের প্রতি তাদের সমর্থন যৌথভাবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নির্বাচিত

গণপ্রতিনিধিদের নির্দেশ অনুযায়ী অতঃপর তাঁরা কাজ করবেন—একথা বলার জন্যে তাঁরা শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকের ব্যবস্থা করলাম। বৈঠকে সানাউল হকের নেতৃত্বে সিভিল সার্ভেন্টদের প্রতিনিধিদলটি আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলি মেনে চলার অঙ্গীকার ঘোষণা করলেন। শেখ মুজিব তাঁদেরকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিলেন এবং আন্দোলনের জন্যে নির্দেশাবলি (Directives) প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনজনকে (তাজউদ্দিন আহমদ, আমীর–উল–ইসলাম ও আমি) প্রতিদিন সিভিল সার্ভেন্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসার পরামর্শ দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে এটাই হয়ে উঠেছিল প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র (nucleus)।

৭ মার্চ জনসভার জন্যে দলীয় অবস্থান বিবেচনার উদ্দেশ্যে ৬ মার্চ শেখ মুজিবের বাসভবনে আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির সদস্যদের বৈঠক ডাকা হল। সারা দেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত ছাত্র ও যুবসমাজ এ–ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে কেবল স্বাধীনতাই একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য হতে পারে। এটা পরিষ্কার ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুবসম্প্রদায় এবং রাজনীতিসচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনোকিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়দায়িত্বের ভার ছিল শেখ মুজিব এবং দলের ওপরই ন্যস্ত। ৭ মার্চ স্বাধীনতা–ঘোষণার সম্ভাব্য সার্বিক ফলাফল তাই সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। একতরফা স্বাধীনতা–ঘোষণার অর্থ দাঁড়াত সামরিক বাহিনীকে তার সকল শক্তি নিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করা। এতে তারা যে কেবল শক্তিপ্রয়োগের ছুতো খুঁজে পেত তা–ই নয়, বলপ্রয়োগে তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে তারা সবকিছুর ওপর সকল উপায়ে আঘাত হানত। কোনো নিরস্ত্র জনগোষ্ঠী কি ঐ ধরনের হামলার আঘাত সহ্য করে বিজয়ী হতে পারে? বহির্বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়াই–বা কী দাঁড়াবে? অন্যান্য দেশের সরকারগুলো কি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে? একটি সুসংগঠিত সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্যে যতদিন প্রয়োজন ততদিন টিকে থাকতে পারবে তো? এসব প্রশ্ন ছাড়াও, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের বিরাজমান বিভিন্নমুখী বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক স্বার্থসমূহের কারণে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে তারা মেনে নেবে এবং স্বীকৃতি দেবে তো?—অজস্র প্রশ্নের মধ্যে এগুলো ছিল কয়েকটি যা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হল। বৈঠকে শেখ মুজিব বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন মত শুনলেন, তবে নিজের অভিমত সংরক্ষিত রাখলেন। যাবতীয় মতামতই বৈঠকে প্রকাশিত হল। ঐ বৈঠক যখন চলছিল তখন বেতারে ইয়াহিয়া খান আবির্ভূত হলেন এবং একটি বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিটি ছিল সুনির্দিষ্টভাবে উসকানিমূলক এবং বাঙালি–অনুভূতির প্রতি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। বিরাজমান পরিস্থিতির জন্যে ইয়াহিয়ার বিবৃতিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করা হল। প্রকারান্তরে ভীতি প্রদর্শনের স্বরে বিবৃতিতে বলা হল :

পর্যাপ্ত শক্তিপ্রয়োগ করে পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সক্ষম জানা সত্ত্বেও আমি বিশেষভাবে বিবেচনা করেই পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও খুনখারাবি থেকে আইনভঙ্গকারীদের বিরত রাখতে শক্তি–প্রয়োগ একেবারেই কম মাত্রায় করা হয়।

... পরিশেষে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতায় বহাল আছি, আমি পাকিস্তানের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করব। এ–প্রশ্নে কোনো সন্দেহ ও ভ্রান্তি যেন না থাকে। এই দেশকে রক্ষায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে। আমার কাছে এটা তাদের প্রত্যাশা এবং আমি তাদের হতাশ করব না। নিরীহ কোটি কোটি পাকিস্তানির এই মাতৃভূমিকে আমি অল্পকিছু মানুষের হাতে ধ্বংস হয়ে যেতে দেব না। পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব পালনে তারা কখনো ব্যর্থ হয়নি।

হম্বিতম্বিগুলো বাদ দিলে বার্তাটি ছিল এরকম যে, ইয়াহিয়া বিশ্বাস করেন পরিস্থিতির একটি সামরিক সমাধান সম্ভব এবং 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার' প্রয়োজনে তিনি যে–কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাঁর বিবেচনানুযায়ী প্রয়োজনীয় যে–কোনো মাত্রার শক্তিপ্রয়োগের জন্যে নিজেকে যথাযোগ্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করেন।

ইয়াহিয়ার বার্তায় হুমকিটি ছিল পরিষ্কার। বেতার–ঘোষণাটি শেষ হওয়ার পর শেখ মুজিব নির্বাহী কমিটির বৈঠক ঐদিন সন্ধ্যার পর পর্যন্ত মুলতবির নির্দেশ দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে তিনি পরদিনের জন্যে গ্রহণীয় কর্মপন্থার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছিল শেখ মুজিবের ওপর। তিনি শীর্ষস্থানীয় দলীয় নেতৃবৃন্দ সর্বজনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানের পরামর্শ চাইলেন। আমাকেও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হল। খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার ফলাফল সতর্কতার সঙ্গে হিসেব করে দেখা হল। সেনাবাহিনী একটি সামরিক হামলা চালানোর সুযোগ খুঁজছিল এবং এ–ধরনের কোনো ঘোষণা যে তাদেরকে সেই সুযোগটিই যোগাবে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। সিদ্ধান্ত হল যে, ঐ সুযোগ আপাতত তাদের দেয়া উচিত হবে না। একই সঙ্গে আন্দোলনের গতি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা–হস্তান্তরের জন্যে ইয়াহিয়ার ওপর চাপও বজায় রাখতে হবে। বিবেচনা করে দেখা হল যে, যদি আন্দোলনের জোয়ার ধরে রাখা এবং জনগণের ঐক্য জোরদার করা যায়, তা হলে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ তাদের লক্ষ্যঅর্জনে ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হল যে, পরদিন খোলাখুলি স্বাধীনতা–ঘোষণার অবস্থান নেয়া হবে না। ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হবে এবং ঐসব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ঐসব দাবির মধ্যে থাকবে সেনাবাহিনীকে

ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আরও সৈন্য আনা বন্ধ করা এবং যে-সব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার তদন্ত করা। শেখ মুজিব নির্দেশ দিলেন যে, দুটি প্রধান দাবি জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। দাবি দুটি হল অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতনিধিদের কাছে ক্ষমতা-হস্তান্তর।

৭ মার্চের জনসভার পর সংবাদ-মাধ্যমে দেয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের অবস্থান তুলে ধরে আমাকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির খসড়া তৈরি করতে বলা হল। যে-ঘোষণা দেয়া হবে তার গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণের পরপরই সংবাদ-মাধ্যমে দেয়ার জন্যে ঘোষণার একটি লিখিত ভাষ্য প্রস্তুত রাখা উচিত। ঐদিনই সন্ধ্যার মধ্যে একটি খসড়া ভাষ্য তৈরি করা হল। ঐ ভাষ্যে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা-হস্তান্তরের দাবি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে শেষ অনুচ্ছেদে বলা হল :

আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হল অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা-হস্তান্তর। এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অসহযোগ আন্দোলন চলবেই।

শেখ মুজিব নির্দেশ দিলেন যে, প্রস্তুতকৃত ভাষ্যটি তাজউদ্দিন আহমদের হেফাজতে থাকবে এবং জনসভায় ভাষণটি প্রকৃতপক্ষে যেভাবে দেয়া হবে তার আলোকে যদি প্রয়োজন হয় সে-অনুযায়ী সংশোধন করে তা প্রচারের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তাজউদ্দিন আহমদই পালন করবেন।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল মাত্র ১৯ মিনিটের। ভাষণের মূল বাক্যটি ছিল : ***এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।*** অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং নির্বাচিত গণপ্রতিধিদের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট দাবিও তুলে ধরা হল। লিখিত ভাষ্যটি যথাযথভাবে পরিমার্জিত করে তাজউদ্দিন আহমদ তা প্রচারের জন্যে সংবাদমাধ্যমে পাঠালেন। কাজেই চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির হল 'স্বাধীনতা', কিন্তু শেখ মুজিব কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত রইলেন ; কেননা এটা পরিষ্কার ছিল যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তারা অবস্থানও নিয়ে ফেলেছে যাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তারা আক্রমণ শুরু করতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববর্তী মধ্যরাত (৬ মার্চ) ইয়াহিয়ার একটি বার্তা নিয়ে একজন ব্রিগেডিয়ার এসেছিলেন দেখা করতে। বার্তায় বলা হয়েছিল যে, ইয়াহিয়া খুব শিগ্‌গিরই ঢাকায় আসার ইচ্ছা রাখেন এবং এমন একটি মীমাংসায় পৌঁছার আশা করছেন যা বাঙালিদের সন্তুষ্ট করবে। এটা ছিল এক চাতুর্যপূর্ণ যোগাযোগ এবং একে দেখা হয়েছিল তার (ইয়াহিয়ার) বেতার-ভাষণের ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার এবং ৭ মার্চ জনসভায় শেখ মুজিবের সম্ভাব্য অবস্থানকে প্রভাবিত করার প্রয়াস হিসেবে। এটাকে তাঁর (ইয়াহিয়ার) জন্যে একটা অজুহাত তৈরির চেষ্টা হিসেবেও দেখা হল এভাবে যে, যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় তা হলে ইয়াহিয়া সারা পৃথিবীকে বলতে পারবেন যে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছার জন্যে তিনি ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু

শেখ মুজিবই একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে শক্তিপ্রয়োগে বাধ্য করেছেন। ৭ মার্চ একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া থেকে শেখ মুজিবের বিরত থাকার ক্ষেত্রে এটাও ছিল বিবেচনার আরেকটি বিষয়।

পরবর্তী সপ্তার জন্যে আরও কর্মসূচি ঘোষণা করা হল। 'কর ও খাজনা বন্ধে'র আন্দোলন বহাল রইল। জরুরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে ৭ ও ৯ মার্চ আরও কিছু অব্যাহতি ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করা হল। নির্দেশ দেয়া হল যে রেলওয়ে ও বন্দরসমূহ চালু থাকবে, কিন্তু জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর আয়োজন হিসেবে সৈন্য–চলাচল ও মোতায়েনের জন্যে রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহারের চেষ্টা করা হলে রেল ও বন্দর–শ্রমিকরা সহযোগিতা করবে না। ৮ মার্চ প্রচারিত ঘোষণায় ব্যাংকগুলোর ওপর সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ জারি করা হল। বাঙালি ব্যাংকারদের কয়েকটি বৈঠক এবং তাঁদের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের বেশকিছু প্রকৃত সমস্যা তুলে ধরার পর ব্যাংকগুলোর জন্যে নতুন নির্দেশ জারি হল। এসব নতুন নির্দেশে কল–কারখানা চালু রাখার স্বার্থে শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং লেনদেন এবং প্রকৃত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এক হাজার টাকা পর্যন্ত তোলার অনুমতি দেয়া হল। সুনির্দিষ্টভাবে জরুরি অর্থনৈতিক তৎপরতা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হল যে, সার ও পাওয়ার পাম্পগুলোর জন্যে ডিজেল সরবরাহের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলো খোলা থাকবে। এ ছাড়া খাদ্য সরবরাহ, ইটখোলাগুলোতে কয়লা সরবরাহ এবং ধান ও পাটের বীজ সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশ দেয়া হল।

পর্যায়ক্রমিকভাবে নির্দেশমালা তৈরি করতে বাঙালি ব্যাংকারদের সঙ্গে এবং করাচি থেকে আসা স্টেট ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন বাঙালি কর্মকর্তা এ কে এন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ...

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় পৌছলেন। ১৬ মার্চ সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠক চলল। এরপর শেখ মুজিব ফিরে এলেন এবং দলের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। আমাকেও ঐ আলোচনায় যোগ দিতে বলা হল। বস্তুত পরবর্তী দিনগুলোতে ইয়াহিয়া অথবা তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে যখনই কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার পরপরই দলীয় নেতাদের বৈঠকে তা পর্যালোচনার পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

শেখ মুজিব জানালেন যে, জাতীয় পরিষদ স্থগিত করার ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করে ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু করেন। শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে ইয়াহিয়া গুরুতর ভুল করেছেন। ইয়াহিয়া বলেন, তিনি বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে চান। এ–পর্যায়ে শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে বলেন, যা ঘটে গেছে এবং জনগণের যে–মনোভাব তার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মার্চ তিনি যে–দাবি উত্থাপন করেছেন তার চেয়ে কম কোনোকিছু মেনে নেয়া, বিশেষত অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা–হস্তান্তরের চেয়ে কম কোনোকিছুই জনগণের কাছে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে না। ইয়াহিয়া জানান যে,

একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ক্ষেত্রে আইনগত সমস্যা রয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। এ–পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, তিনি তাঁর নিজের আইন উপদেষ্টাদের নির্দেশ দেবেন যাতে তাঁরা ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টি আলোচনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে এই উপলব্ধির সঞ্চার করেন যে ঐ ক্ষেত্রে (সামরিক শাসন প্রত্যাহার) কোনো আইনগত সমস্যা দেখা দেবে না।

এরপর শেখ মুজিব আমাকে ঐ কথিত আইনগত সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা করতে ঐদিনই সন্ধ্যায় লে. জেনারেল পীরজাদার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলেন। সন্ধ্যায় আমি পীরজাদার সঙ্গে দেখা করলাম এবং সেই সুযোগে অভিযোগ তুললাম যে, যে–পদ্ধতিতে তাঁরা পরিষদ স্থগিত করেছেন তা অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম যে, ব্যাপারটিকে গোটা বাঙালি জনগণের জন্যে অবমাননাকর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। পীরজাদাকে অপ্রতিভ মনে হল এবং তিনি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা–হস্তান্তরের প্রসঙ্গে এলেন। তিনি বললেন, শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার আগে সামরিক শাসন তুলে নেয়া হলে আইনগত শূন্যতা দেখা দেবে। আমি তৎক্ষণাৎ পালটা যুক্তি দেখিয়ে বললাম যে, সামরিক শাসন তুলে নেয়া এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা আদেশ (কার্যত একটি অন্তর্বর্তী শাসনতন্ত্র) জারি করা যেতে পারে এবং প্রেসিডেন্ট/প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যে–আদেশ বলে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করবেন সেই একই আদেশে তা জারি করা যেতে পারে। পরবর্তী আলাপ–আলোচনায় এই যুক্তি লক্ষণীয়ভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

পরদিন, ১৭ মার্চ সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা–হস্তান্তরের দাবি পুনর্ব্যক্ত করলেন। ইয়াহিয়া আবারও আইনগত সমস্যার কথা বললেন এবং জানালেন, বিষয়টি বিবেচনার জন্যে তিনি তাঁর আইনবিষয়ক উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াসকে তলব করেছেন। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ দলের (team) একটি বৈঠকের প্রস্তাব করা হল। ঐদিনই সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন লে. জেনারেল পীরজাদা, বিচারপতি কর্নেলিয়াস এবং কর্নেল হাসান (সেনাবাহিনীর জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল)। বৈঠকের শুরুতে পীরজাদা বললেন, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে সকালের বৈঠক এই ভিত্তির ওপর এগিয়েছে যে, ইয়াহিয়া একটি ফরমান জারি করবেন। তিনি জানালেন যে, মুজিব–ইয়াহিয়া আলোচনা থেকে ঐ ফরমানে অঙ্গীভূত হবে এমনকিছু সুনির্দিষ্ট মৌলিক উপাদানও বেরিয়ে এসেছে। পীরজাদা বললেন, শেখ মুজিব প্রস্তাব করেছেন যে, পূর্বাঞ্চলের গণপ্রতিনিধিরা পূর্বাঞ্চলের জন্যে এবং পশ্চিমাঞ্চলের গণপ্রতিনিধিরা পশ্চিমাঞ্চলের জন্যে পৃথক পৃথকভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তারপর তাঁরা (সকল গণপ্রতিনিধি) পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে একসঙ্গে বসবেন। একথাও বলা হয়েছে যে, পূর্বাঞ্চলের জনগণ যাতে ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন পায়

শাসনতন্ত্রে সেরকম ব্যবস্থা থাকবে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলো ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে একটি প্রদেশকে যে-পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছিল সেই পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। এর বাইরে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত হবে। কর্নেলিয়াস পরামর্শ দিলেন যে, এ-ধরনের একটি দলিল (অন্তর্বর্তী শাসনতন্ত্র) জাতীয় পরিষদে গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমেই বলবৎ করা উচিত। এরপর প্রস্তাব করা হল যে, সবচেয়ে ভালো হয় যদি এ-ধরনের কোনো দলিল-প্রণয়নের কাজে হাত দেয়ার আগে উভয়পক্ষের উপদেষ্টারাই শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে একটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈঠকে বসেন যাতে মৌলিক দিকনির্দেশনাগুলো সরাসরি তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব হয়।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয় যে, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ একটি সামরিক আইনবিধি প্রণীত হয়েছিল, যাতে প্রাদেশিক গভর্নরদের সহায়তা ও পরামর্শের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ গঠন এবং সামরিক আইন পেছনে হটিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ক্ষেত্রে কর্নেলিয়াস ও পীরজাদা যে-আইনগত শূন্যতার প্রশ্ন তুলেছিলেন তা পরীক্ষা করে দেখা ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে। পালটা-যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল যে, ফরমান-বলে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা-আদেশ জারি করা যেতে পারে যা সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও একটি শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

দলিলপত্রে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে ইয়াহিয়া ১৭ মার্চের বৈঠকের পর জেনারেল টিক্কা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'প্রস্তুত হও' (Get ready)—এবং সেই অনুযায়ী ১৮ মার্চ সকালে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাও ফরমান আলি 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নীল নকশা তৈরি করেন। আর ঐ 'অপারেশন সার্চলাইট'ই ছিল ২৫ মার্চ সারা প্রদেশ জুড়ে তারা যে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞমূলক সামরিক অভিযান শুরুর পরিকল্পনা করে তার সাংকেতিক নাম।

১৯ মার্চ সকালে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আরেক দফা বৈঠক হয় এবং ঐ বৈঠকেও শেখ মুজিব আবারও জোর দিয়ে বলেন যে সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ হল অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করা এবং এ-লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা-আদেশ জারি করা। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের ফরমান-বলেই ঐ আদেশ জারি করা যেতে পারে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগ দলের (team) সঙ্গে বৈঠকে বসলেন।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয় যে, ঐ বৈঠকে আওয়ামী লীগের দাবি 'আইনগতভাবে যতখানি সম্ভব' পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের দল (team) একটি সম্ভাব্য সামরিক আইনবিধি পেশ করেছিলেন। বৈঠকে ঐ ধরনের কোনো সামরিক আইনবিধি প্রণীত হওয়ার ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি। বস্তুর পরদিন সকালের বৈঠকেও আইনগত শূন্যতা-সংক্রান্ত বাদানুবাদে

প্রচুর সময় ব্যয় করা হয় এবং কেবল এর পরই এ–ব্যাপারে আদৌ কোনো দলিলপত্র (instrument) তৈরির প্রশ্নটি আলোচনায় আসে।

২০ মার্চ সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ঐ সাক্ষাতে শেখ মুজিব সঙ্গে নিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও আমাকে। ইয়াহিয়ার পক্ষে ছিলেন পীরজাদা, কর্নেলিয়াস ও কর্নেল হাসান।

আগের দিন সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকবহর টঙ্গী অতিক্রমকালে জনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সেনাদল ও জনগণের মধ্যে গোলাগুলি চলে। বস্তুত এটা ছিল জনগণ কর্তৃক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়ের একটি ঘটনা। পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে ঘটনাটিকে পাকিস্তানি জাহাজ এমভি সোয়াতযোগে সেনা–সরবরাহের স্বাভাবিক চলাচলে জনগণের বাধা দেয়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালিদের চোখে ঐ সরবরাহ ছিল জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানোর উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রের প্রতীক। পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে ইয়াহিয়া বললেন, যদিও তিনি আলোচনার উদ্দেশ্যেই এসেছেন এবং সেনাবাহিনীকেও সংযত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আওয়ামী লীগ 'সামরিক সরবরাহে' বাধা দেবে এটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিবও দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, যখন আলোচনা চলছে, সৈন্যরা তখন ব্যারাকে থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। প্রতিবাদে ইয়াহিয়া বললেন, সৈন্যরা যদি ব্যারাকেও থাকে তা হলেও সেনা সরবরাহ অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। শেখ মুজিব তখন বললেন, এভাবে সৈন্যদের ট্রাকে চলাচলের বিষয়টিই জনগণের কাছে উসকানিমূলক, কারণ, এরকম সৈন্যরাই অতীতে বহু নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে। বস্তুত মাত্র ক'দিন আগেই টঙ্গীর খুবই কাছে জয়দেবপুরে এ–ধরনের এক ঘটনায় সৈন্যরা নিরস্ত্র সাধারণ মানুষজনের ওপর গুলি চালিয়ে বেশ ক'জনকে হত্যা করে। কাজেই স্থানীয় জনগণের অনুভূতি ছিল সংবেদনশীল। শেখ মুজিব বললেন, জনগণের স্পর্শকাতর অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্যদের দিক থেকে উসকানিমূলক কিছু করাটা ঠিক হবে না। তিনি আরও বললেন, নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালানো হতে থাকলে, এটা জানা কথা যে শেষ পর্যন্ত পালটা গুলি চালানোর জন্যে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেবেই। কাজেই আর রক্তপাত নয়, একটি রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য।

শেখ মুজিবের এই কঠোর বক্তব্য ইয়াহিয়ার ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলল বলে মনে হল। ইয়াহিয়া তখন রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তিনি একজন সরল মানুষ এবং যদিও তিনি শেখ মুজিবের দাবিগুলো নীতিগতভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা তাঁকে বলেছেন যে, একটি শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার আগে সামরিক শাসন প্রত্যাহার আইনগত শূন্যতা সৃষ্টি করবে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, এ–ধরনের কোনো শূন্যতাই সৃষ্টি হবে না যদি শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে অস্থায়ী ব্যবস্থা আদেশের আকারে একটি দলিল (instrument) ইয়াহিয়া নিজেই জারি করেন। এ–বিষয়ে যখন আরও

যুক্তিতর্ক উত্থাপিত হতে যাচ্ছিল তখন আমার মনে হল, বিষয়টি নিরসনের একটি উপায় হতে পারে এই পরামর্শ দেয়া যে, এ কে ব্রোহির মতো একজন শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে দিয়ে বিষয়টি পরীক্ষা করিয়ে নেয়া হোক—যাঁর অভিমত তাঁরা (ইয়াহিয়া ও তাঁর উপদেষ্টারা) গ্রহণ করতে পারবেন। আমি জানতাম ব্রোহি তখন ঢাকায় আছেন এবং সুনিশ্চিত ছিলাম যে, আইনগতভাবে সঙ্গত হওয়ায় আওয়ামী লীগের অবস্থানকেই ব্রোহি সমর্থন করবেন। আমি আরও জানতাম যে, কর্নেলিয়াস ব্রোহিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেন, কাজেই আমার পরামর্শ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। আমার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হল, কারণ কর্নেলিয়াস তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এই বলে যে, এ–ধরনের অভিমত আলোচ্যক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আমি ব্রোহির অভিমত গ্রহণের ও তা বৈঠকে পেশ করার দায়িত্ব নিলাম। শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার উদ্দেশে বললেন, তাঁরা (মুজিব ও ইয়াহিয়া) যে–রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবেন বিশেষজ্ঞরা তা কার্যকর করার উপায় উদ্ভাবন করবেন। শেখ মুজিব জোর দিয়ে বললেন, "আমরা যদি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাগুলো দেয়ার ব্যাপারে একমত হই, তা হলে সেগুলো কার্যকর করার পন্থা উদ্ভাবনের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের।"

এরপর বলা হল যে, প্রস্তাবিত দলিলটিতে যে–সব মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে তা লিখে রাখা দরকার। যে–খসড়া ফরমানটি তৈরি করা হবে তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে বলে নির্ধারিত হল :

ক. সামরিক শাসন প্রত্যাহার ;

খ. নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা–হস্তান্তর ; এবং

গ. পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন (গুরুত্ব আরোপ করা হল যে এই স্বায়ত্তশাসন হবে ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে)।

স্থির হল, সিদ্ধান্তটি কীভাবে কার্যকর করা হবে সে–ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঐদিনই সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন।

এরপর ইয়াহিয়া বললেন, তিনি মনে করছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ করা উচিত। শেখ মুজিব বললেন, সেটা একান্তভাবেই তাঁর (ইয়াহিয়ার) ব্যাপার এবং তিনি ইচ্ছে করলেই তা করতে পারেন। ইয়াহিয়া বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সম্মতি চাওয়াটা তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, কারণ তা না হলে দায়দায়িত্ব নিজের ওপর বড় বেশি পরিমাণে নেয়া হবে। তিনি আরও বললেন, তিনি চান ওই ফরমান জারির ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ জানানো হোক।

ইয়াহিয়া এরপর বললেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের, বিশেষ করে ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব করছেন। শেখ মুজিব বললেন যে, প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলেই তা করতে পারেন এবং সেটা একান্তভাবেই তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে, শেখ মুজিব বললেন, তিনি নিজে ভুট্টোর সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করবেন না, ইয়াহিয়া পৃথকভাবে ভুট্টোর সঙ্গে বসতে পারেন। মাত্র ৬ সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত আলোচনাকালে

এবং তারপর ভুট্টো ও তাঁর দল যে-আচরণ করেছেন, এটা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি বহিঃপ্রকাশ। এর আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ ছিল এই যে, ভুট্টো ও ইয়াহিয়া মূলত একই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ; সুতরাং তাঁদেরকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনার সুযোগ দেয়ার অর্থ দাঁড়াত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ রকমের সুবিধা দেয়া। আমি বললাম, কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপযোগী একটি খসড়া সরকারপক্ষের দিক থেকেই তৈরি হওয়া উচিত। কারণ এক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে সম্ভাব্য সহায়তাটুকু তাঁরাই আদায় করতে পারবেন। পরামর্শ দেয়া হল যে, এ জন্যে আইন মন্ত্রণালয়ের আইনবিষয়ক মুসাবিদাকারীদের (Legal Draftsmen) তলব করা যেতে পারে। খসড়া তৈরি হওয়া মাত্রই তার একটি অনুলিপি যেন আওয়ামী লীগের পক্ষে আলোচনাকারী দলের জন্যে পাঠানো হয়, সে-ব্যাপারেও কথা হল।

২১ মার্চ সকালে শেখ মুজিব আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এবং তাজউদ্দিন তখন আলোচনারত ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, তিনি ক্ষমতা-হস্তান্তরের বিষয়টি ভালোভাবে ভেবে দেখছেন এবং তাঁর মনে হচ্ছে কেবল প্রদেশগুলোতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে চাপ দেয়াটাই কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক। তিনি আরও বললেন, বাঙালি জনগণের মাঝে যে-চেতনা বিরাজ করছে, তাতে আওয়ামী লীগের জন্যে কেন্দ্রের ক্ষমতা গ্রহণ করাটা ঠিক হবে না। মনে হয়, বেশকিছু কারণ ছিল যে-গুলো বিচার-বিবেচনা করে শেখ মুজিব ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন :

১. বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে এই চেতনা জোরালোভাবে বিরাজ করছিল যে, গণআন্দোলন নিয়ে কোনো আপস নয়—এবং 'ক্ষমতা'র জন্যে আওয়ামী লীগ তার দাবি পরিত্যাগ করবে না। কেন্দ্রে ক্ষমতাগ্রহণকে সে-ধরনের আপোস হিসেবে দেখানোর সুযোগই তৈরি হবে। বস্তুত ছাত্রনেতাদের কয়েকজন এর আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়টি জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন।

২. শাসনতন্ত্র না থাকা অবস্থায় কেন্দ্রে ক্ষমতাগ্রহণ আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রে ব্যর্থ অথবা অকার্যকর প্রতিপন্ন হওয়ার ঝুঁকির মুখে ফেলবে এবং এভাবে এমনকি শাসনতন্ত্র তৈরি হওয়ার আগেই নিজেদেরকে বদনামের শিকার করে তুলবে।

৩. কেবল প্রদেশে ক্ষমতা গ্রহণই একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পূর্বাঞ্চলে তার অবস্থান সংহত করতে পারবে কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, পাঞ্জাবি আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর চাপের মাঝে থেকে যে-দায়িত্বপালন দুরূহ হয়ে উঠতে পারে।

৪. কেবল প্রদেশে ক্ষমতা গ্রহণ একটি সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আওয়ামী লীগকে প্রাদেশিক সরকারের সকল সহায়-সম্পদ, বিশেষত পুলিশ ও ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) বাহিনীর শক্তিকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ এনে দেবে, যে-ধরনের পরিস্থিতির আশঙ্কা তীব্রভাবেই ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছিল, ইয়াহিয়া নিজেই প্রদেশে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফর্মুলা নিয়ে এগুবেন, কারণ এতে তিনি কেন্দ্রে তাঁর নিজের অবস্থান বজায় রাখতে পারবেন।

অতএব, শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন অবিলম্বে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বসতে চাইলেন। তাঁরা ইয়াহিয়াকে বললেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কেবল প্রদেশগুলোতে অবিলম্বে ক্ষমতা–হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে ব্রোহি একটি সামগ্রিক অভিমত লিখিত আকারে তৈরি করে তা স্বাক্ষর করে দিলেন। সেটি কর্নেল হাসানের কাছে দেয়া হল। কাজেই খসড়া–ফরমানের আইনগত কার্যকারিতার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ কোনো শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞের সমর্থন উপস্থাপিত করতে পারেনি—একথার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে ডাহা মিথ্যাচারিতা করা হয়েছে মাত্র।

২১ মার্চ জানানো হল যে, প্রেসিডেন্টের একটি ফরমানের খসড়া, যা কর্নেল হাসানের তৈরি বলে কথিত, প্রস্তুত রয়েছে। সেটি আনতে একজনকে পাঠানো হল। আওয়ামী লীগের আলোচকদল খসড়াটি পরীক্ষা করে দেখলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তাড়াহুড়ো করে সেটি তৈরি করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, খসড়ায় পূর্বাঞ্চলের জন্যে বিধিবিধান প্রণয়নে পূর্বাঞ্চলের সদস্যদের একটি পৃথক কমিটিতে বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এবং একইভাবে পশ্চিমাঞ্চলের সদস্যদেরও আরেকটি কমিটিতে পৃথকভাবে বসার বন্দোবস্ত ছিল। খসড়ায় এ–রকম ব্যবস্থা ছিল যে, যেদিন প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করবেন, সেদিন থেকেই সামরিক শাসন বাতিল বলে গণ্য হবে। খসড়াটি পরীক্ষা করে আওয়ামী লীগ আলোচক–দল এই সিদ্ধান্তে পৌছল যে, সেটি বিভিন্ন দিক থেকেই অসম্পূর্ণ এবং বেশকিছু বিষয় যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ হয়নি। প্রথম কথা হল, আওয়ামী লীগ দলের মতে, সামরিক শাসন প্রত্যাহারের বিষয়টি সত্বর ঘটা উচিত এবং এ–ব্যাপারে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের দিন থেকে কার্যকর হওয়ার মতো দীর্ঘসূত্রিতামূলক প্রক্রিয়ায় যাওয়া উচিত নয়। কারণ পাঁচটি প্রদেশের বিষয় এক্ষেত্রে জড়িত বিধায় প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হতে পারে। ফরমানটি যাতে আরও দ্রুত কার্যকর হতে পারে সে–উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ দল অভিমত প্রকাশ করল যে, ফরমানটি জারির পর সাত দিন অতিক্রান্ত হওয়া অথবা প্রাদেশিক গভর্নরদের নিয়োগ—এ–দুটির মধ্যে যেটি আগে ঘটবে, সেই মুহূর্ত থেকেই ফরমানটি (অর্থাৎ সামরিক শাসন প্রত্যাহার) কার্যকর হবে।

ইতিমধ্যে ২১ মার্চ বিকেলে ভুট্টো এসে পৌছলেন। আমার মনে পড়ে—সংশোধিত আকারে খসড়াটি যখন উপস্থাপিত করা হল, কর্নেলিয়াস একথা বলতে উদ্বুদ্ধ হলেন যে, সেটি অবশ্যই একটি উন্নততর এবং অধিকতর পূর্ণাঙ্গ খসড়া। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললাম যে, একে আওয়ামী লীগের রূপরেখা হিসেবে বর্ণনা করা উচিত হবে না। এই রূপরেখা তৈরির সমগ্র কাজটি একটি যৌথ প্রচেষ্টা হেসেবে গণ্য হওয়া উচিত। এরপর সংশোধিত খসড়া–ফরমানটির দফাওয়ারী পাঠ করা শুরু হল। পীরজাদা বললেন, তিনি ভুট্টোর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বসবেন। তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সংশোধিত খসড়াটির একটি অনুলিপি ভুট্টোর কাছে পাঠানো হয়।

ভুট্টোর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁরা ঢাকা এসে পৌছার সময়কার পরিস্থিতি এ রকম :

ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি প্রেসিডেন্টস হাউসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রেসিডেন্ট ১৬ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর পর্যায়ক্রমিক বৈঠকগুলোর ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলেন। যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ তারিখে এক সংবাদ-সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে, আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে। প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগের ও প্রেসিডেন্টের পক্ষের বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও বৈঠক হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আমাকে আওয়ামী লীগ নেতার প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করলেন।

প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলো ছিল, অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-হস্তান্তর ছাড়াই পাঁচটি প্রদেশে ক্ষমতা-হস্তান্তর। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট বর্তমান পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অব্যাহত রাখবেন। অথবা যদি তিনি চান তা হলে এজন্যে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে নেয়া উপদেষ্টাদের সহায়তাও গ্রহণ করতে পারেন। এটাও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, প্রথমাবস্থায় (ab initio) জাতীয় পরিষদ দুটি পৃথক কমিটিতে বিভক্ত থাকবে : একটি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে, এবং অপরটি বাংলাদেশের জন্যে ঢাকায়। কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে তাদের রিপোর্ট তৈরি করবে এবং তাদের প্রস্তাবগুলো জাতীয় পরিষদে পেশ করবে। এরপর ঐ উভয় কমিটির প্রস্তাবগুলোর ওপর আলোচনা ও বিতর্ক চালানো এবং একসঙ্গে থাকার পথ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করার (find out ways and means of living together) দায়িত্ব হবে জাতীয় পরিষদের। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি সংশোধিত রূপের আওতায় পূর্ব পাকিস্তানকে ছয়দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত ক্ষমতা ভোগ করবে, তবে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষে তারা (পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা খুঁজে বের করে নেয়ার স্বাধীনতা পাবে। পুরো পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্টের একটি ফরমানের আকারে জারি করা হবে।

ভুট্টো এরপর বলেছেন : "পুরো প্রস্তাবটি বর্ণনা করার পর ইয়াহিয়া আমাকে বললেন, তিনি শেখ মুজিবকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, ঐ প্রস্তাবে তাঁর (ইয়াহিয়ার) সম্মতি প্রাথমিকভাবে আমার (ভুট্টোর) একমত হওয়ার ওপর নির্ভর করবে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারাও যদি মত দেন তা হলে তিনি আরও বেশি সন্তুষ্ট হবেন।"

২২ মার্চ সকালে আলোচনা আবার শুরু করতে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন। এদিকে খসড়া-ফরমানের লিখিত ভাষ্য নিয়ে তখন দুপক্ষের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রের বিবরণ সত্য নয় যে, ঐ সময় ইয়াহিয়া বুঝিয়েসুঝিয়ে ভুট্টোকে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে রাজি করান। আসলে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভুট্টোকে সেখানে উপস্থিত

দেখতে পান এবং তাঁকে একপাশে টেনে নিয়ে সামান্য কথাবার্তা বলেন। এ–ব্যাপারে শেখ মুজিব পরে জানিয়েছেন তিনি ভুট্টোকে পরামর্শ দেন যে, অন্য কেউ যাতে তাঁদের কথা শুনে না ফেলে সে জন্যে বাইরের বারান্দায় গিয়ে কথা বলাই ভালো। শেখ মুজিবের সঙ্গে ওই সাক্ষাতের ব্যাপারে ভুট্টোর নিজের বর্ণনা এরকম :

২২ তারিখ সকালে পূর্বনির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে আমি প্রেসিডেন্টস হাউসে পৌঁছলাম। মুজিবুর রহমান সেখানে উপস্থিত হলেন ঠিক এগারোটায়। আমরা পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম এবং সামান্য কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বললাম।

এরপর আমাদেরকে প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আরেকদফা আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা বিনিময় হল। . . .

মুজিবুর রহমান এরপর প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট চূড়ান্ত সম্মতি দিয়েছেন কি না। প্রেসিডেন্ট তাঁকে (শেখ মুজিবকে) স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ঐ ব্যাপারে আমারও (ভুট্টো) সম্মতি থাকা প্রয়োজন এবং সে–কারণেই আমিও আলোচনায় উপস্থিত রয়েছি। জবাবে মুজিবুর রহমান মন্তব্য করলেন যে, প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়েছে এবং আমাকে (ভুট্টো) সম্মত করানোর দায়িত্বটা প্রেসিডেন্টের। মুজিবুর রহমান এরপর বললেন যে, মিঃ ভুট্টো ঐ প্রস্তাব নীতিগতবাবে মেনে নিলেই কেবল তাঁরা আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসতে পারেন, এর আগে কথাবার্তা হলেও তা হবে অনানুষ্ঠানিক, এবং প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর তিনি সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেবেন যে, তিনি (শেখ মুজিব) প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং ঘটনাচক্রে ভুট্টোও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জবাব দিলেন যে ব্যাপারটা তেমন ভালো দেখাবে না, কিন্তু মুজিবুর রহমান তাঁর কঠোর মনোভাব বহাল রাখলেন ...

বেরিয়ে আসার পথে আমরা যখন প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবের কক্ষে প্রবেশ করলাম তখন শেখ মুজিবুর রহমান আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন এবং সে–কারণে ঐ কক্ষে উপবিষ্ট জেনারেল মোহাম্মদ ওমর, জেনারেল ইসহাক, প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব এবং প্রেসিডেন্টের ন্যাভাল এডিসি (aide-de-camp)–কে ঐ কক্ষ পরিত্যাগের নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁর মনোভাবের এই আকস্মিক পরিবর্তনে কিছুটা বিস্মিত হলাম। মুজিব আমার হাত ধরে টেনে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। তিনি আমাকে বললেন যে, পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর এবং তা কাটিয়ে উঠতে তিনি আমার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করছেন। এ–সময় ঐ কক্ষে আড়ি পাতার ব্যবস্থা থাকতে পারে মনে করে আমরা বারান্দার দিকে চলে গেলাম এবং প্রেসিডেন্টের বৈঠকখানার পেছনের চত্বরে বসলাম।

শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক সচিবের কক্ষে আমাকে যা বলেছিলেন সে–কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ঘটনা অনেক বেশিদূর গড়িয়ে গেছে এবং ফেরার কোনো পথ নেই। মুজিবের মতে ঐ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার সবচেয়ে ভালো উপায় হল তাঁর প্রস্তাবে আমার রাজি হয়ে যাওয়া। তিনি জোর দিয়ে বললেন, এর আর

কোনো বিকল্প নেই। মুজিব বললেন, তিনি এখন উপলব্ধি করছেন যে পিপলস পার্টিই পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র শক্তি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনীতিক কেবল তাঁর সময় নষ্ট করছেন। মুজিবুর রহমান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে বললেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের সকলকেই তিরস্কার করেছেন কেবল খান আবদুল ওয়ালি খান ছাড়া, যাঁর দল অন্তত একটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তিনি বললেন, তিনি এখন উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের দুজনের ঐকমত্য খুবই জরুরি। তিনি আমাকে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানে আমি (ভুট্টো) যেমনটা চাই তেমনই করতে পারি এবং তিনি আমাকে সমর্থন দেবেন। বিনিময়ে আমাকে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিতে হবে এবং আওয়ামী লীগের প্রস্তাব যাতে বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করতে তাঁকে (মুজিব) সহায়তা করতে হবে। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আমার উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া, এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব নেবেন। তাঁর মতে, সংকট কাটিয়ে ওঠার এটাই ছিল একমাত্র পথ। তিনি আমাকে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে তাদের বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিলেন। মুজিব বললেন, ওরা (সামরিক বাহিনী) যদি প্রথমে তাঁকে (মুজিব) ধ্বংস করে, তা হলে ওরা পরে আমাকেও (ভুট্টো) ধ্বংস করবে। আমি জবাব দিলাম যে, ইতিহাসের হাতে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে আমি বরং সামরিক বাহিনীর হাতে ধ্বংস হতেই পছন্দ করব। মুজিব আমাকে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে এবং গোড়া থেকেই (ab initio) দুটি কমিটির গঠন মেনে নিতে চাপ দিলেন।

আমি তাঁকে বললাম যে আমি তাঁর প্রস্তাব অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখব এবং একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছতে যা-কিছু সম্ভব সবই করব। তবে, প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপ যা-ই হোক-না কেন, জাতীয় পরিষদের মাধ্যমেই তা গৃহীত হওয়া উচিত এবং যদি প্রয়োজন হয় প্রেসিডেন্টের ফরমান জারি অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমেও তা হতে পারে। আমি তাঁকে জানালাম যে, পরিষদের বাইরে তৈরি প্রস্তাবের যোগসূত্রে আমি কোনো চিঠি দিতে প্রস্তুত নই। মুজিবুর রহমান এ-ধারণা বাতিল করে দিলেন যে, পরিষদের বৈঠক আদৌ বসবে, এমনকি সংক্ষিপ্তভাবেও। বন্দোবস্তের প্রকৃতি যা-ই হোক-না কেন, জাতীয় পরিষদ সারা দেশের জন্যে একটি পরিষদ হিসেবে বৈঠকে বসা ছাড়াই তিনি তা পুরোপুরি সেরে নেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ঐরকমের অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বিদায় নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলাম এবং আমরা পরস্পরকে বিদায় জানালাম। আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ।

ভুট্টোর বর্ণনা শেখ মুজিবের মৌলিক অবস্থানকে সমর্থন করে। তবে, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাবলি অনুমোদন করতে প্রথমে অবশ্যই জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসতে হবে বলে ভুট্টোর নিজের অবস্থানের যে-দাবি করা হয়, এই পর্যায়ে তা আর বিদ্যমান ছিল না। কারণ শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে এই সাক্ষাতের পরে ভেতরে-বাইরে উভয়তই এই ধারণাই দেয়া হয় যে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা, ক্ষীণভাবে হলেও, দেখা দিয়েছে। বস্তুত আওয়ামী লীগ আলোচকদলের কাছে এই সাক্ষাতের বর্ণনা

প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেছিলেন, তিনি মনে করেন, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো অন্তত তাঁদের নিজেদের সর্বোত্তম স্বার্থেই প্রস্তাবিত রূপরেখা অনুযায়ী একটি সমাধানের প্রয়োজনীয়তা হয়তো উপলব্ধি করেছেন। কারণ, তাতে অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের অবস্থান নিরাপদ থাকে, ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকতে এবং ভুট্টো সিন্ধু ও পাঞ্জাব লাভে সক্ষম হবেন। আর যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিই পশ্চিমাঞ্চলের জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে, ভুট্টোর দলই কার্যত সেই কমিটিতে প্রাধান্য পাবে। আমার মনে পড়ে, বিদেশি সাংবাদিকদের কয়েকজন বলেছিলেন, 'দুই কমিটি' পদক্ষেপ ঠিক তা-ই হয়ে উঠতে পারে—পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো যা চাইছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে একটি সমঝোতার লক্ষণ দেখা দেয়ায় ২২ তারিখটি ছিল একটি ক্ষীণ আশা সঞ্চারের দিন। ২২ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ আলোচক-দল খসড়া-ফরমানটি নিয়ে আমার অফিসে বসল। শেখ মুজিব এবং দলের অন্যান্য নেতাও সেখানে উপস্থিত হলেন। খসড়াটি শেষ পর্যন্ত একটি ফরমানে পরিণত হতে যাচ্ছিল, কাজেই সেটি আগাগোড়া খুবই সতর্কতার সঙ্গে পড়ে দেখা হল। খসড়াটির একটি চূড়ান্ত রূপ দিতে রাতভর কাজ চলল।

২৩ মার্চ ছিল একটি ব্যতিক্রমি দিন। অন্যান্য বছর দিনটি 'পাকিস্তান দিবস'রূপে পালিত হত। কিন্তু '৭১-এর ২৩ মার্চ হাজার হাজার বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি হল। আমার মনে পড়ে, ভোর ৬টার দিকে আমি যখন সংশোধিত খসড়াটির কপিসহ গাড়ি নিয়ে আমার অফিস থেকে বের হলাম, তখন নওয়াবপুর রেলক্রসিং থেকে আমিও একটি বাংলাদেশ-পতাকা কিনলাম। সংশোধিত খসড়াসহ সকাল ৭টায় আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পৌঁছলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে অনেক মিছিল এসে উপস্থিত হল এবং শেখ মুজিবের বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হল। অধিকাংশ বাড়িঘর এবং গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে লাগল।

বেলা সাড়ে ১১টায় গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আওয়ামী লীগ আলোচকদল প্রেসিডেন্টস হাউসে উপস্থিত হল। প্রেসিডেন্টস হাউসে সামরিক কর্মকর্তা যখন ঐ পতাকা দেখলেন তখন তাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুব সহজেই চোখে পড়ল।

আওয়ামী লীগ আলোচক-দল যখন ভেতরে প্রবেশ করল তখন তাদের বলা হল যে, খসড়ার আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিধানসমূহের তাৎপর্য পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে এম এম আহমেদ এবং আরও ক'জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসা হয়েছে। বস্তুত এম এম আহমেদ এই বলে তাঁর কথা শুরু করলেন যে, তাঁর ধারণা, ছোটখাটো কিছু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযোগী করে নিলেই ছয়দফা কর্মসূচিকে কার্যকারিতা দেয়া যাবে। এ-সময় পীরজাদা প্রস্তাব করলেন, এম এম আহমেদ আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসতে পারেন এবং এক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে নুরুল ইসলামের নাম উল্লেখ করলেন। আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা, নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান এবং অন্যেরা—

প্রতিদিনই নুরুল ইসলামের বাসভবনে মিলিত হচ্ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের সংশোধিত খসড়ার আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিধানগুলো তাঁদের দ্বারা সমর্থিত ছিল। তবে আওয়ামী লীগের আলোচকদল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আরেক দফা বৈঠকের প্রস্তাব গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। কারণ তা ছিল সময়নাশের পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগের আলোচকরা উপলব্ধি করলেন যে, ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা প্রতিটি অনুচ্ছেদের ওপর আলোচনা লম্বা করার চেষ্টা করে সুস্পষ্টভাবে দীর্ঘসূত্রিতার কৌশল গ্রহণ করেছেন। ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় বৈঠকে এম এম আহমেদ খসড়ায় সংশোধন ও সংযোজনের আকারে বেশকিছু চিরকুট হাজির করলেন। এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের প্রশ্নে এম এম আহমেদ কিছুটা নমনীয়তাও দেখালেন। তিনি বললেন, বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিতে কোনো সমস্যা নেই। বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে তিনি বললেন, পররাষ্ট্রনীতির বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে থাকলে সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভব। স্টেট ব্যাংক পুনর্গঠনের ব্যাপারে তিনি বললেন, এটাও করা সম্ভব এবং অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে স্টেট ব্যাংকের ঢাকা শাখা বাংলাদেশের রিজার্ভ ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবও আলাদা করা যেতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি থেকে অর্জিত আয় ঢাকা শাখার একটি হিসাবে রাখা যেতে পারে। কর আদায় ব্যাবস্থার পৃথকীকরণ নিয়ে অধিকতর জটিল সমস্যা দেখা গেল, তবে ঐকমত্য হল যে, আওয়ামী লীগ অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে এ-ব্যাপারে একটি কার্যকর কর্মসূচি উপস্থিত করবে।

এরপর আওয়ামী লীগের আলোচকদল অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বাসভবনে লাগাতারভাবে বৈঠকরত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেখানে এম এম আহমেদের তৈরি সংশোধনীগুলো আলোচিত হল এবং কর-সংগ্রহ, বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা ও সেই সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিসমূহ সতর্কভাবে সূত্রবদ্ধ ও প্রস্তুত করা হল যাতে সন্ধ্যার পর সরকারপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে তা উপস্থিত করা যায়।

২৩ মার্চ সন্ধ্যায় অর্থনৈতিক বিষয়াদির ওপর আলোচনা আবার শুরু করতে প্রেসিডেন্টস হাউসে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ আলোচকদল জানতে পারল যে, ইয়াহিয়া সারাদিন ধরেই বাইরে রয়েছেন। পীরজাদা তাঁর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানের ব্যাপারে কিছু-একটা বললেন। পরবর্তী তথ্য-প্রমাণাদিতে জানা গেছে, ২৩ মার্চ ছিল সেই দিন, যেদিন 'জেনারেলরা' বৈঠক করছিলেন। এখন নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে, ঐ বৈঠকেই 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় এবং পরিকল্পনার দুজন প্রণেতা ব্যক্তিগতভাবে ঢাকার বাইরে ব্রিগেড কমান্ডারদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ পৌছে দিতে ২৪ মার্চ হেলিকপ্টারযোগে তাদের কাছে যান। এসব ঘটনা থেকে সুনিশ্চিতভাবে এ-সিদ্ধান্তেই পৌছা সম্ভব যে, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিধানসমূহের ওপর এম এম আহমেদ আওয়ামী লীগ দলের সঙ্গে যে-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সরকারপক্ষ তা দীর্ঘায়িত করছিল কেবল একটি আড়াল তৈরি করে সময়ক্ষেপণ করতে, যখন আসল প্রস্তুতি চলছিল ক্যান্টনমেন্টে, এক 'সামরিক সমাধান'

কার্যকর করার জন্যে। ২৪ মার্চ সকাল নাগাদ আওয়ামী লীগ দল অর্থনৈতিক বিধানগুলোর ওপর আলোচনা এবং বিতর্কযোগ্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা খসড়া–ফরমানটির দফাওয়ারী পাঠগ্রহণ শেষ করে। ২৪ মার্চ সন্ধ্যার বৈঠকের জন্যে যখন আওয়ামী লীগ আলোচকদল রওনা হতে যাচ্ছে তখন শেখ মুজিব বলে দিলেন, রাষ্ট্রের নামের জন্যে আমরা যেন 'পাকিস্তান কনফেডারেশন' (Confederation of Pakistan) নামটি প্রস্তাব করি। তিনি ইঙ্গিত দিলেন আমরা যেন ব্যাখ্যা করি যে জনগণের অনুভূতির স্বার্থে এর প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রস্তাব স্বাধীনতার জন্যে জনগণের অনুভূতির তীব্রতা আংশিকভাবে হলেও সুনির্দিষ্টভাবেই প্রতিফলিত করে, কারণ উত্তালভাবে এগিয়ে চলা গণআন্দোলনের অগ্রবাহিনীর তরুণ জঙ্গি নেতাদের দ্বারাই তা উদ্ভাবিত ও উচ্চারিত (articulated) হয়েছিল।

সরকারপক্ষের কাছে যখন ঐ প্রস্তাব তুলে ধরা হল তখন তারা প্রবল প্রতিবাদ জানাল এই বলে যে, এতে আমাদের অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা যুক্তি দেখালাম যে, অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অপরিবর্তিত থাকায় কেবল নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন কোনো মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় না। কাজেই আমাদের প্রস্তাবের একটি সীমিত, তবে টিকে থাকার উপযোগী (Viable) যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সরকারের ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবেই রয়েছে। কর্নেলিয়াস আমাদের যুক্তি উপলব্ধি করলেন বলে মনে হল, তবে তিনি পালটা প্রস্তাব তুললেন যে, 'কনফেডারেশন'–এর পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দটি গ্রহণ করা যেতে পারে। আওয়ামী লীগ দল এরপর নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলল, বিরোধের এই বিষয়টি কেবল একটি শব্দসংক্রান্ত এবং এই পর্যায়ে যদি এর নিরসন না–ও ঘটে তা হলে খসড়াটি চূড়ান্ত আকারে যখন শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে পেশ করা হবে তখন তাঁদের বৈঠকে এ–বিষয়ে মীমাংসা হতে পারে।

আওয়ামী লীগ আলোচকদল উপলব্ধি করছিল যে, বাইরের পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করছে, সৈন্যরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রবাহী জাহাজ এমভি সোয়াত থেকে মাল খালাস করতে গেলে লাখ–লাখ নিরস্ত্র মানুষ চট্টগ্রাম বন্দর অভিমুখী পথ অবরোধ করে রেখেছে। রংপুর থেকেও সামরিক তৎপরতার খবর পাওয়া গেল। ঢাকায় খবর এসে পৌঁছতে লাগল যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সৈন্যরা হামলা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাজেই অনুভূত হচ্ছিল যে, ২৪ তারিখের সন্ধ্যার বৈঠকটিই হয়তো শেষ বৈঠক হতে যাচ্ছে যাতে আলোচনার ইতি টানতে হবে, কারণ খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা আরও দীর্ঘায়িত করার কোনো অর্থ নেই।

সন্ধ্যায় খসড়া–ফরমানের সকল অনুচ্ছেদ ও তফসিলের পাঠগ্রহণ শেষ হল। এরপর আমি খুবই তাগিদ দিয়ে পীরজাদাকে জিজ্ঞেস করলাম—খসড়াটি কখন চূড়ান্ত করা হবে? আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হল যে, পরদিন সকালে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার সামনে পেশ করার জন্যে খসড়াটির চূড়ান্ত রূপ দিতে আমি ঐ রাতে কর্নেলিয়াসের সঙ্গে বসতে পারি। কর্নেলিয়াস রাজি ছিলেন, কিন্তু পীরজাদা তাঁকে (কর্নেলিয়াসকে) থামালেন আমাদের উদ্দেশে এই বলে যে, 'না, আজ সন্ধ্যায়

আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা আছে, আপনারা বরং কাল সকালে আসুন।' যখন আমি বললাম যে পরদিন সকালের জন্যে তা হলে একটি সময় নির্ধারণ করা হোক—পীরজাদা আবারও বাধা দিয়ে বললেন, টেলিফোনেই কাজটি সারা যাবে এবং তিনি ফোন করবেন। এরপর পীরজাদা আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, "ফরমানটি কখন ঘোষণা করা উচিত বলে মনে করেন?" জবাবে আমি বললাম, "এটা গত পরশুই ঘোষণা করা উচিত ছিল এবং ঘটনাবলি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে (আমার মনে তখন চট্টগ্রাম পরিস্থিতি এবং রংপুরে নিরস্ত্র মানুষ ও বাঙালি পুলিশের ওপর সৈন্যদের গুলিবর্ষণের খবর ঘুরপাক খাচ্ছিল) তাতে সময় ফুরিয়ে যেতে পারে।" এই পর্যায়ে তাজউদ্দিন বললেন যে, আওয়ামী লীগ আলোচকদল মনে করেন, তাঁরা সবকিছুই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা করার মতো আর কিছু বাকি নেই। এখন আর যা করার আছে তা হল চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে খসড়াটি শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার সামনে পেশ করা। তাঁরা অনুমোদন করলেই ফরমানটি জারি হতে পারে। তাজউদ্দিনের এই বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই ধারণা দেয়ার জন্যে যে, আওয়ামী লীগই আলোচনা ভেঙে দিয়েছে। বস্তুত ঐ ব্যাখ্যা সত্যের অপলাপ মাত্র। আলাপ-আলোচনা বিশদভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যা প্রয়োজন ছিল তা হল খসড়াটির চূড়ান্ত রূপ দিয়ে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার সামনে তা উপস্থাপন করা। ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাতের আগে সারাক্ষণ আমি একটি টেলিফোন পাওয়ার অপেক্ষা করলাম। ঐ টেলিফোন কখনোই আসেনি। এমনকি ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আমি যখন শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখনও শেখ মুজিব আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি ঐ টেলিফোন পেয়েছি কি না। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি তা পাইনি। ঐ রাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি জনগণের ওপর আক্রমণ চালাল এবং গণহত্যা ও রক্তস্নান শুরু হল, যা এড়ানোই ছিল আলাপ-আলোচনা চালানো ও দরকষাকষির মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানোর প্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য।

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ : সুমন মাহমুদ